হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিচয়

কিউ এস খান
B.E (Mech)

Tanveer Publication
Hydro Electric Machinari Primaises
A-13, Ram Rahim Udyog Nagar, Bus stop lane,
L.B.S Marg, Sonapur, Bhandup (West)
Mumbai- 400078
Phone - 022-25965930 Cell- 9320064026
E-mail- hydelect@vsnl.com, hydelect@mtnl.net.in
Website- **www.freeeducation.co.in**

No Copyright

The copyright of this book is with Q. S. Khan. But if nothing is reduced from or added to it, it is permitted for anyone to translate and print it without the permission of the copyright owner. If you find any mistake in this book, please inform us, so that we may correct it in the future editions of the book.

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিচয়

ISBN No-978-93-80778-21-1

First Edition : Feb 2014

Price: **₹ 30/-**

Printed by

Al Qalam PUBLICATION PVT. LTD.

3, Gali Garhaiyya Bazar Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Tel :- 011-23241481, 23261481. Fax :- 011-23241481.

E-mail :- alqalambooks@gmail.com

প্রস্তাবনা

ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডকে ৪৫০ কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর আমাদের আত্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। (পবিত্র কুরআন (৭:১১) অর্থাৎ আমরা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এক বিশাল লম্বা সময় অবধি অবস্থান করছি। আত্মা নষ্ট হয় না। এজন্য ভবিষ্যতে অনন্তকাল ধরে আমরা থাকব।

আগত অনন্তকাল ব্যাপী জীবনে আমরা সুখে থাকব না দুঃখে থাকব, সেটা আমাদের এই ৬০ বৎসরের পার্থিব জীবনের উপর নির্ধারিত হয়। আমরা কোন্ জীবনবিধান অবলম্বন করলে আমাদের মৃত্যুর পর আমরা সুখপ্রাপ্ত হ'ব-এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এর জন্য আপনার নিজেকে অনুসন্ধান করতে হবে এবংজ্ঞান অর্জন করতে হবে। আমার আপনার পূর্বেও বহু প্রাজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ এমনই অনুসন্ধান এবংজ্ঞান অন্বেষণ ও চর্চা করেছিলেন।

এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে এমনই কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তিগণের মতামত পেশ করা হয়েছে যাঁরা আজীবন অনুসন্ধান, গবেষণা ও জ্ঞান-চর্চার কাজকরেছেন এবংকোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

মহাপুরুষ জ্ঞানী শ্রী বেদব্যাস, মহাকবি তুলসীদাস, সন্ত তুকারাম, যীশুখ্রিস্ট এবংআরও অনেক বিদ্বান মহাপুরুষগণ হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রশংসা করেছেন। যদি আমরাও হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে পারি, তাঁকে যাঁচাই ও পরীক্ষা করতে পারি এবংতারপর নিজের বিশ্বাসকে স্থির করতে পারি, নির্ণয় করতে পারি, তাহলে আমাদের মৃত্যুর পর পরকালে এবংএই পৃথিবীর ইহকালেও আমাদের সফল হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

এই পুস্তক এইজন্যই লেখা হয়েছে। শোনা কথায় বিশ্বাস করবেন না। ধর্ম প্রসঙ্গে সমস্ত তথ্যকে যাচাই ও পরীক্ষা করুন। অনুসন্ধান ও অনুশীলন করুন এবংসঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার ধর্ম ও বিশ্বাসের দিশা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আপনার উদাসীনতা আপনার পরকালীন জীবনকে বরবাদ করে দিতে পারে। সুতরাংএ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতা অবলম্বন করুন, গুরুত্ব দিন এবংসঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হানাহানি হচ্ছে। মানুষের মধ্যে যে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে এই পুস্তকের মাধ্যমে তা হ্রাস পাবে বলে আমি আশা করি। আমি অন্যান্য বইপুস্তক অধ্যয়ন করে এই পুস্তক রচনা করেছি। হতে পারে কোনও কিছু উপলব্ধি করতে কিংবা লিখতে গিয়ে আমার ভুল হয়ে গেছে। এই পুস্তকের কোনও কথা যদি কারও চিন্তা-ভাবনাকে আঘাত করে কিংবা কাউকে সম্মান করে থাকে, অথবা এর মধ্যে এমন কিছু বিবৃত হয়েছে যা ভুল তথ্য সমৃদ্ধ, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে অবগত করবেন। সেগুলি সংশোধন করার জন্য আমার আন্তরিক ও পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকবে।

আপনার ভাই

কিউ এস খান
hydelect@vsnl.com

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পূর্ববর্তীগণ	৭
২.	হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার	১৫
৩.	হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পয়গম্বর হওয়ার পূর্বের জীবন	১৮
৪.	হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পয়গম্বর হওয়ার পরের জীবন	২১
৫.	হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বিদ্বানব্যক্তিদের অভিমত	৩২
৬.	হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আচরণ কেমন ছিল	৪৪
৭.	হযরত মুহাম্মদ সা. এর উপদেশ	৫৬
৮.	একক ঈশ্বরের অস্তিত্ব: তার প্রমাণ	৬৭
৯.	পয়গম্বর কারা?	৭২
১০.	পয়গম্বরদের শত্রু কারা?	৭৮
১১.	হযরত মুহাম্মদ (সা.) কি হিংসার শিক্ষা দিতেন?	৮৪
১২.	হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ১২ জন স্ত্রী কেন ছিল?	৯৯
১৩.	অগ্নির রহস্য কি?	১১১
	একনজরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী	১১৭

মুদ্রিত কতিপয় শব্দ ও বাক্যের বিস্তৃত রূপ:

BC: Before Christ - ঈসা মসীহ্-র জন্মের পূর্বে

AD: Before Christ - ঈসা মসীহ্-র জন্মের পরে

(সা.): সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ঈশ্বর হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের উপর কৃপা বর্ষণ করুন)

(রাযি): রাযিআল্লাহু আনহু (ইশ্বর তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন)

(আ.): আলাইঞ্হু ওয়া সাল্লাম (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)

৭. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পূর্ববর্তীগণ

হযরত আদম (আ.)

● বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম লেখা হয়ে থাকে। ঈশ্বর (আল্লাহ)ই খালিক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ব্রহ্মাস্বরূপ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনিই পালনকর্তা (বিষ্ণু) এবংতিনিই জন্মের পর মৃত্যু দান করেন। তাঁরই নির্দেশে মহা প্রলয় সংঘটিত হবে। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যজনিত নামকে মহেশ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্ম অনুযায়ী তাঁর অপর নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবংমহেশ্বর। তথাপি ঈশ্বর একই।

● ভবিষ্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, আদম এবংহাওয়াকে বিষ্ণু গলে যাওয়া মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। প্রদান নগর (জগৎ)-এর পূর্ব অংশে ঈশ্বর সৃষ্ট চার ক্রোশের একটা খুব বড় জঙ্গল ছিল। (ক্রোশ কিলোমিটারের থেকে বেশি)। নিজের পত্নী (হাওয়া)কে দেখার জন্য উদ্বিগ্নতার সঙ্গে আদম পাপ-বৃক্ষের নীচে গেল। তখনই সাপের রূপ ধারণ করে কলি (শয়তান) সেখানে আবির্ভূত হল। ওই চালাক দুশমনের মাধ্যমে আদম এবংহব্বাবতী (হাওয়া) প্রতারিত হ'ল এবংওই বিষবৃক্ষের ফল আদম খেয়ে ফেলল ও বিষ্ণুর আদেশকে লঙ্ঘন করল। পরিণামে তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তাদের উভয়ের অনেক সন্তানসন্ততি জন্মলাভ করল। আদমের বয়স ছিল ১৩০ বৎসর। (ভবিষ্য পূরাণ)

● এই কথা কুরআনে লেখা হয়েছে এবংবাইবেলেও লেখা হয়েছে।

● সনাতন ধর্মে (হিন্দুধর্মে) পয়গম্বরদের মনু বলা হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে ১৪ জন মনুর কথা বলা হয়েছে। হযরত আদম হলেন প্রথম মনু। সপ্তম মনুর যুগে মহা প্লাবন হয়েছিল এবংতিনি মনুস্মৃতি লিখেছিলেন।

সমস্ত মানবজাতি হযরত আদমেরই সন্তান। ঋগ্বেদে এইভাবে বলা হয়েছে।

● জন মনুজাতা। (ঋগ্বেদ ১:৪:৫১)

সবাই মনুর সন্তান (ঋগ্বেদ ১:৪৫:১)

এই কথাই পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে– 'হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।' (পবিত্র কুরআন- ৪৯:১৩)

তাহলে হযরত আদম (আ.) আমার, আপনার, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবংসকলের সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ।

হযরত নূহ (মনু) (আ.)

● মার্কন্ডেয় পূরাণ, ভবিষ্য পূরাণ, মৎস্য পূরাণে বলা হয়েছে যে, মনুর যুগে এক মহাপ্লাবন হয়েছিল। তখন কেবল মনু এবংএক ঈশ্বরকে মান্যকারী লোকেরা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মানুষ প্লাবনে ডুবে মারা গিয়েছিল।

নূহ (আ.) (মনু) নিজের হাতে একটি নৌকা তৈরী করেছিলেন এবংতাতে তিনি

স্বয়ংআরোহণ করেন এবংএক ঈশ্বরকে মান্যকারী সমস্ত মানুষদের তুলে নেন। সমস্ত প্রকার প্রাণীদেরও জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় তুলে নিলেন। তারাই মাত্র জীবিত বেঁচে গিয়েছিল, বাদবাকি গোটা দুনিয়ার সব এই বন্যায় ডুবে গিয়েছিল।

একথা কুরআনেও লেখা হয়েছে (পবিত্র কুরআন, ১১:২৫-৪৮)। এ কথা বাইবেলেও বলা হয়েছে। (জেনিসিস ৬-৮)

হযরত নূহ (মনু) হযরত আদম (আ.)-এর নবম পীড়ির বংশধর। এঁদের দুইজনের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম এই রকম:

স্ত্রদম-শীষ-অনুশ, কেনান, মাইলেল-ইয়ারীদ, অংকুশ (ইডউইল) মুদূ শল্ক-লুনিক-নূহ। নূহ অর্থাৎ মনু আমার, আপনার, হযরত মুহাম্মাদ সা. এবংসমস্ত মানুষের প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষ। (www.wikipedia.org)

হযরত ইবরাহীম (আ.)

● এক ঈশ্বরকে মানুষ অনেক নামে স্মরণ করে। যেমন, আল্লাহ, মালিক, রহীম, রহমান ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ৯৯টি নাম রয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু নাম তাঁর বিশেষ গুণাবলীর জন্য। যেমন, খালিক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা (ঈশ্বর)। কেননা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনও সৃষ্টিকর্তা নেই। মালিক অর্থাৎ OWNER। ঈশ্বর ছাড়া এই জগৎসংসারের অন্য কোনও মালিক নেই। এজন্য এটাও ঈশ্বরের এক বিশেষ নাম।

● কিন্তু ঈশ্বরের এমন কিছু নামও আছে যেগুলি তাঁর বৈশিষ্ট্য স্বভাবগত (Features)। যেমন রহীম অর্থাৎ অত্যন্ত দয়ালু। গফুর অর্থাৎ ক্ষমাশীল।

কখনো কখনো ঈশ্বর তাঁর গুণবাচক নামে সেই সমস্ত পয়গম্বরদেরকে সম্বোধন করেছেন যাদের মধ্যে ওইসব গুণ রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে রহীম এবংগফুর নামে সম্বোধন করেছেন। (পবিত্র কুরআন ৯:১২৮) কেননা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল ছিলেন।

অনুরূপভাবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে ঈশ্বর বহু পয়গম্বরকে নিজেরই নামগুলির মাধ্যমে স্মরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, হরিবংশ পুরাণে উল্লেখ আছে– ব্রহ্মা তাঁর দেহকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একভাগ পুরুষ এবংঅন্যভাগ স্ত্রী।

এই কথা হাদীস এবংবইবেলেও রয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর বাম দিকের অংশ থেকে হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে হরিবংশ পুরাণে যাকে ব্রহ্মা বলা হয়েছে, তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বয়ংঈশ্বর নন, হযরত আদম (আ.)।

এইভাবে অথর্ববেদে হযরত ইবরাহীম (আ.)কে ব্রহ্মা বলা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে যে, ব্রহ্মা তাঁর নিজপুত্র অথর্বকে বলি (কুরবানি) দিয়েছিলেন। এইকথা কুরআনেও বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজপুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)কে কুরবানী দিয়েছিলেন। (পবিত্র কুরআন-৩৭:১০৫)। এবংএই রকম বাইবেলেও হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক কুরবানীর বর্ণনা রয়েছে (Genenis 22)। তাহলে অথর্ববেদে যাঁকে ব্রহ্মা বলা হয়েছে তিনি স্বয়ংঈশ্বর নন

বরংতিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। ইহুদী, খ্রিস্টান এবংমুসলমান সবাই হযরত ইবরাহীম (আ.)কে একজন মহান পয়গম্বর হিসাবে মানে এবংহযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বপুরুষও।

● হযরত ইবরাহীম (আ.) মনুর দশম বংশধর। তাঁদের নাম এইরকম:-

নূহ (মনু)-সাম-অরফকশদ-শালীখ-আবীর-ফালিখ-অব্রাগু-শাহরূ-তাহীর-তারীহ (আজাহুর)-ইবরাহীম। (www.wikipedia.org)

হযরত ইসমাঈল (আ.) (অথর্ব)

অথর্ববেদে ব্রহ্মা (হযরত ইবরাহীম)-এর নিজপুত্র হযরত ইসমাঈল (স্া.) (অথর্ব)-কে কুরবানী দেওয়ার যে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে পুরুষ মেধা বলা হয়েছে। পুরুষ মেধার দু'টি শ্লোক এই রকম:

मूर्घानमस्य संसीव्यथर्वा हदयं च यत्।
मस्तिशकाददुर्ध्व पैरयत् पवमानोधि
शीशति:
तद् वा अतर्वरा: शिरो देवकोश: समुब्जित:
तत् प्रारो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मन:
(অথর্ববেদ ১০:২:২৬)

শেষ শ্লোকের অর্থ: 'ব্রহ্মা যেখানে অথর্বের কুরবানী দিতে চেয়েছিলেন সেখানে ফেরেশতারা থাকে। এবংঈশ্বর তাকে রক্ষা করেন।' (অথর্ববেদ ১০:২:২৬)

উপরে বর্ণিত অথর্ববেদের শ্লোকে যাকে অথর্ব বলা হয়েছে তাঁকে আরবি ভাষায় হযরত ইসমাঈল বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ৬১তম বংশধর।

● হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবংঅথর্ব (হযরত ইসমাঈল)-এর মধ্যে প্রসিদ্ধ যেসব মানুষগুলি চলে গেছেন তাঁরা হলেন (অথর্ব) ইসমাঈল-সাবাফ-ইয়াসাব-নাফর-আদনান-মাআদ-নাজার-নাসর-ইলিয়াস-কানানা-নফর-মালিক-ফিক্‌র-গালিব-লোবাই-কাব-মুরা-খিলাব-কোশাই-আবদে মানাফ-হাশিম-আব্দুল মুত্তালিব-আবদুল্লাহ-পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। (www.vietorynewsmagazine.com/Anestryofprophetmuhameds.htm

মক্কায় বসবাসকারীদের বৈশিষ্ট্য

● বর্তমান ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে মারওয়াড়ী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। রাজস্থানে না হয় বর্ষা আর না আছে চাষাবাদ। ওখানকার মানুষরা না খেয়ে মরবে এমনটাতো হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু সেখানকার মানুষরা গোটা দেশের উপর কর্তৃত্ব করছে। এমনটা কেন?

কেননা তাদের পূর্বপুরুষরা কেউই গরীব কৃষক ছিল না। কৃষকরা সবসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। বর্ষা হল তো পেট ভরল। তা নাহলে অভুক্ত অবস্থায় জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু রাজস্থানের মানুষ যাদের বর্ষার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তারা নিজেদের বাহুবলে ভাত জুটিয়ে নেয়। বুদ্ধির প্রয়োগ করতে থাকে এবংব্যবসা এবংসেনাবাহিনীতে যথেষ্ট উন্নতি সাধান করে বেঁচে আছে।

● ঈশ্বর তাঁর নিজের ঘর (কাবা)কে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বানিয়েছেন এবংসেখানকার পরিবেশ মরুভূমির থেকেও বেশি কঠিন করে

দিয়েছেন। সেখানে চাষাবাদের কোনও সম্ভাবনা নেই। মানসিকভাবে পরাধীন এবংগরিব কৃষকদের ওখানে বাস করার কোনও সম্ভাবনা নেই।

এজন্য যারাই মক্কাতে বসবাস করত তারা মারওয়াড়ীদের থেকে বেশি ব্যবসায়ী এবংরাজপুতদের থেকে বেশি বাহাদুর ছিল। কেননা ওখানে বেঁচে থাকা রাজস্থানে বেঁচে থাকার থেকে অনেক বেশি কঠিন ছিল।

মক্কা শহর কিভাবে গড়ে উঠল

● যখন হযরত ইসমাঈল (অথর্ব)-এর জন্ম হয় তখন হযরত ইবরাহীম (অবিরাম-ব্রহ্মা) হযরত ইসমাঈল ও তাঁর মা হযরত হাজেরাকে নিয়ে কাবা শরীফের কাছে রেখে আসলেন। এবংঈশ্বর অলৌকিকভাবে কাবা শরীফের পাশে এমন এক ঝরণাধারা প্রবাহিত করে দিলেন যে, তার পানি যে উদ্দেশ্যে কেউ পান করবে সে সেইমতো ফল পাবে। এই ঝরণার কূপকে যমযম বলা হয়। যদি কেউ ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য এই পানি পান করে তাহলে তার পেট ভরে যাবে। সম্পদ লাভের বাসনায় যদি কেউ এই পানি পান করে তাহলে সে সম্পদশালী হয়ে যায়। রোগ ভালো হওয়ার নিয়তে যদি কেউ পান করে তাহলে তার রোগ দূর হয়ে যায়। হাজীরা হজথেকে ফেরার সময় এই পানি অবশ্যই নিয়ে আসেন এবংআত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে উপহার স্বরূপ বিতরণ করেন। আবে যমযমের এই অলৌকিকতার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা সেখানে আসতে লাগল এবংমক্কা শহরও ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সময় এই শহরের জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৬০ হাজার।

● কাবা ঘরকে ফেরেশতারা পৃথিবীতে বহু পূর্বেই তৈরী করেছিল, কিন্তু এটা মনু (হযরত নূহ)-এর যুগে হওয়া মহাপ্লাবনে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

● যখন হযরত ঈসমাঈল (অথর্ব) বড় হ'ল তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবংহযরত ইসমাঈল (আ.) মিলিতভাবে পুনরায় কাবা নির্মাণ করেন। তখন থেকে হযরত ইসমাঈল আ. এবংতাঁর বংশধররাই এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন।

কাবা ঘর পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.) এবংহযরত ইবরাহীম (আ.)। এজন্য অথর্ববেদে কাবার স্তুতিতে পাঁচটি শ্লোক আছে। তন্মধ্যে একটি শ্লোক এইরূপ:

तस्मिन हिररायये कोशे त्र यरे त्रिप्रतिष्ठते
तस्मिन यद यक्षमात्मन्वत तद वै ब्रह्मविदो
विदु: (अथर्ववेद १०:२:२९)

● অর্থাৎ প্রার্থনার উপযুক্ত ঈশ্বরের এই ঘরে তিনটি স্তম্ভ এবংতিনটি বিম রয়েছে এবংএই ঘর অমর জীবনের কেন্দ্র। ঈশ্বরের উপাসনাকারীরা এই সত্য সম্পর্কে অবগত। (অথর্ববেদ-১০:২:৩২)

● উপরের ছবিটি কাবা শরীফের ভিতরের। আপনি এর মধ্যে তিনটি স্তম্ভ এবংতিনটি বিম

দেখতে পাবেন। (ইন্টারনেটের মাধ্যমেও এর চিত্র অনুসন্ধান করা এবংদেখা যেতে পারে। আভ্যন্তরীণ দৃশ্য (www.youtube.com Link http://youtube/dHTZbn30Zrw-তে কাবা শরীফের ভিতরের দৃশ্য আপনি দেখতে পারেন, এখানে তিনটি স্তম্ভ পরিষ্কার দেখা যায়।)

● পদ্ম পুরানে কাবা শরীফকে আদি পুষ্কর তীর্থ বলা হয়েছে। এখানে লেখা আছে। সমস্ত তীর্থস্থানের মধ্যে আদি পুষ্কর তীর্থ সবথেকে প্রাচীন তীর্থস্থান। আদি পুষ্কর তীর্থে গিয়ে স্নান করলে মুক্তি পাওয়া যায়।' (পদ্ম পুরাণ, কল্যাণ, অক্টোবর ১৯৪৪, পৃষ্ঠা-৯৬, গোরখপুর থেকে প্রকাশিত)।

Inside view

এই শ্লোকে যে স্নানের বর্ণনা আছে তা হল যমযমের পানিতে স্নান করার বর্ণনা। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মৃত্যুর পর সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষরা এক ঈশ্বরকে ছেড়ে বহু দেবদেবীর উপাসনা করতে লাগল। কাবা শরীফের ভিতরে ৩৬০টি মূর্তি রাখা ছিল। মানুষের এ ধরনের পাপাচারের ফলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের উপর থেকে তাঁর অনুগ্রহ তুলে নিলেন এবংযমযমের পানি শুকিয়ে গেল। দীর্ঘকাল যাবৎ যমযম এভাবে শুষ্ক হয়ে পড়েছিল এবংতার চিহ্নও মুছে গেল।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দাদা (পিতামহ)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতামহের নাম ছিল আমীর। কিন্তু তিনি আব্দুল মুত্তালিব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, দানশীল এবংআকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রের সরদার ছিলেন। তিনি হজযাত্রীদের জন্য খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতেন। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। রমযান মাসে হেরা গুহায় তিনি এক ঈশ্বরের উপাসনা করতেন একমাস যাবৎ। তারপর ওখান থেকে ফিরে এসে দরিদ্রভোজন করাতেন। কাবা শরীফের নিকটে যমযম নামে অলৌকিক ও বিস্ময়কর যে কূয়া ছিল, জনগণের মূর্তিপূজার কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে ঈশ্বর যে কূয়াকে শুষ্ক করে দিয়েছিলেন, কিছুদিন পর এই কূয়া ধ্বসে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

হযরত আব্দুল মুত্তালিব তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই বিস্ময়কর যমযম কূয়া প্রসঙ্গে শুনেছিলেন। তিনি চাইতেন– ঈশ্বর তাঁর উপর পুনরায় কৃপা বর্ষণ করুন এবংযমযমের পানি পুনরায় দান করুন।

একরাতে ঈশ্বর স্বপ্নের মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবকে ওই স্থান বলে দিলেন যেখানে যমযম কূয়া ছিল। কিন্তু সে সময় স্থানটি ছিল 'ইস্নাফ' ও 'নাইলা' এই দুই মূর্তির মাঝখানে। এজন্য মানুষরা ওই জায়গায় খনন করা খারাপ মনে করল এবংতাঁকে কোনও সাহায্য করল না।

বাধ্য হয়ে হযরত আব্দুল মুত্তালিব নিজের বড় ছেলে হারীসকে সঙ্গে নিয়ে ওই জায়গা খনন করলেন এবংযমযমের পানি বের হয়ে

আসল।

এই যমযমের সন্ধান পাওয়ার ফলে তাঁর সম্মান আরও বেড়ে গেল।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পিতা

যখন লোকেরা হযরত মুত্তালিবকে কূয়া খননকার্যে সাহায্য করল না এবংতাঁকে একমাত্র পুত্রের সাহায্য নিয়ে কূয়া খনন করতে হল তখন তিনি আল্লাহর কাছে দশ পুত্রের জন্য প্রার্থনা করলেন। এবংমানত করলেন যে, যদি তাঁর দশজন পুত্র যুবক হয়ে যায় তাহলে এক পুত্রকে তিনি আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করবেন।

আল্লাহ তাঁকে দশ পুত্র দান করলেন। যখন তারা যুবক হল তখন লটারির মাধ্যমে উৎসর্গিত পুত্রের নাম বের হয়ে আসল। হযরত আব্দুল্লাহর নাম উঠল। হযরত আব্দুল্লাহ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবংসার্বিকভাবে অন্যান্য ভাইদের তুলনায় সর্বোত্তম ছিলেন। বোনেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবংকুরবানি না দেওয়ার জন্য পিতার উপর চাপ সৃষ্টি করল।

এই সমস্যা নিয়ে যখন পণ্ডিতদের কাছে সমাধান চাওয়া হ'ল তখন তাঁরা বললেন— আব্দুল্লাহ এবংকুরবানির জন্য ১০টি উট একত্রিত করে লটারি করো। সেই লটারিতে যদি পুনরায় আব্দুল্লাহর নাম ওঠে তাহলে কুরবানীর উটের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। এবংলটারি করতে থাকো।

এইভাবে কয়েকবার লটারি করে নাম বের করা হ'ল। পরিশেষে ১০০ উট কুরবানির বিনিময়ে লটারিতে হযরত আব্দুল্লাহর নাম উঠল না এবংতাঁর জীবন বেঁচে গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ, যাঁকে হযরত ইসমাইল (অথর্ব)-এর মতো কুরবানী দেওয়ার কথা ছিল, তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সম্মানিত পিতা।

হযরত আব্দুল্লাহ পূণ্যবান পিতার পূণ্যবান পুত্র ছিলেন। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কপাল থেকে পবিত্রতার জ্যোতি নির্গত হ'ত। এ দেখে এক জ্যোতিষ মহিলা (উম্মে কতাল বিন নোফি) তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব মদীনার সম্মানিত বংশ বনু জোহরার সরদার ওহাব বিন আবদে মানাফের কন্যা হযরত আমিনার সঙ্গে আব্দুল্লাহর বিয়ে দিলেন।

সেইসময় আব্দুল্লাহর বয়স ছিল ২৫ বৎসর এবংআমিনার বয়স ছিল ২০ বৎসর।

বিয়ের পর হযরত আব্দুল্লাহ তিন দিন মদীনাতে ছিলেন। তারপর কয়েক মাস মক্কায় নিজের বাড়িতে হযরত আমিনার সঙ্গে ছিলেন। ওই সময়ে এক বাণিজ্য কাফেলা ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় যাচ্ছিল। হযরত আবদুল্লাহও তাদের সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গেলেন। ফেরার পথে মদীনার কাছে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন তিনি মদীনায় তাঁর মাতুলালয়ে (বনী আসাদ বিন নাজজার) থেকে গেলেন এবংএকমাস অসুস্থ থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহর মৃত্যুর সাত মাস পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ২০/২২ এপ্রিল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্র পঞ্জিকা অনুসারে এই তারিখ হ'ল ১২ রবিউল আউয়াল।

****

২. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নয় জন চাচা ছিলেন।

১) হারীস ২) কাসম ৩) আবু লাহাব ৪) আবু তালিব ৫)হযরত আব্বাস ৬) হযরত হামযা ৭) যুবাইর ৮) মাকুম ৯) সাফার / গোদাক।

হযরত আবু তালিব: হযরত আবু তালিব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে নিজের পুত্রতুল্য প্রতিপালন করেছিলেন এবংনবী (সা.)-এর ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁকে মক্কাবাসীদের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছিলেন।

হযরত আব্বাস: হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু অনেক পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি খুব ধনী মানুষ ছিলেন এবংঅর্থলগ্নীকারক ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মৃত্যুর বহুদিন পর যে আব্বাসীয় বংশোদ্ভূত অনেক খলিফা হয়েছিলেন তাঁরা সবাই হযরত আব্বাসের সন্তানদের সন্তান ছিলেন।

হযরত হামযা: হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চাচা ছিলেন, কিন্তু প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তিনি খুব বাহাদুর মানুষ ছিলেন। হযরত হামযা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন।

আবু লাহাব: নিতান্তই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)এর জন্মের সুসংবাদ প্রদানকারী দাসীকে তিনি খুশি হয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.)-এর পয়গম্বরী প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে তিনি মুহাম্মাদ (সা.)এর শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া অবশিষ্ট আর ৫ জন চাচাও ইসলাম গ্রহণ করেনি।

হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর তিন পুত্র ও চার কন্যার জন্ম হয়েছিল। তিন পুত্রের শিশুকালেই মৃত্যু হয়। এই সাতজন সন্তানের মধ্যে ছয়জনের জন্ম হয়েছিল হযরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইব্রাহীম মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছিল হযরত মারিয়ার গর্ভে। তিন পুত্রের নাম: হযরত কাসিম, হযরত আব্দুল্লাহ (তাহির বা তৈয়ব), হযরত ইবরাহীম।

চার কন্যার নাম

হযরত যয়নব (রা.), হযরত রুকাইয়া (রা.) হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)।

হযরত যয়নাব (রা.)

হযরত যায়নাব (রা.) সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তাঁর বিবাহ তাঁর খালার পুত্র হযরত আবুল আসের সঙ্গে হয়েছিল। তাঁর দুই সন্তান ছিল। পুত্র হযরত আলি বিন আবুল আস (রা.) এবংকন্যা হযরত উমামা বিনতে আবুল আস (রা.)। মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার সময় আবু জেহেলের ছেলে আকরামা তাঁর উটকে জখম করে দিয়েছিল।

তিনি উটের নীচে পাথরের উপর পড়ে যান এবংআহত হন। সে সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। এই দুর্ঘটনার ফলে কয়েক বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

হযরত রুকাইয়া (রা.)

হযরত রুকাইইয়া (রা.) হযরত যয়নাব (রা.)-র থেকে ছোট ছিলেন। তাঁর প্রথমে বিয়ে হয়েছিল আবু লাহাবের পুত্র উৎবার সঙ্গে (কিন্তু বিদায় হয়নি)। ইসলামের শত্রুতায় আবু লাহাব এই সম্পর্ক ভেঙ্গে দিয়েছিল। তখন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁকে পুনরায় বিয়ে দিয়ে দেন হযরত উসমান (রা.)-র সঙ্গে। তিনি প্রথমে হযরত উসমান (রা.)-র সঙ্গে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেছিলেন। তারপর মদিনায় আসেন। তাঁর আব্দুল্লাহ নামে এক পুত্র ছিল। ছয় বৎসর বয়সে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয়। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে হযরত রুকাইয়া (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)

তিনি হযরত রুকাইয়া (রা.)-র থেকে ছোট ছিলেন। তাঁর বিয়েও আবু লাহাবের অন্য এক ছেলে আতীবার সঙ্গে হয়েছিল (বিদায় হয়নি) এবংআবু লাহাব শত্রুতার বশে এই সম্পর্কও ছিন্ন করে দিয়েছিল।

হযরত রুকাইয়া (রা.)-র মৃত্যুর পর একজন পয়গম্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে হযরত উসমান (রা.) সব সময় উদাস হয়ে থাকতেন। হযরত উসমান (রা.) অত্যন্ত সৎ ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। এই পৃথিবীতেই যেসব মানুষরা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন হযরত উসমান (রা.) তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলেন। তিনি হযরত রুকাইয়া (রা.)কে খুব ভালোবাসতেন। এজন্য হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হযরত উম্মে কুলসুমের সঙ্গে হযরত উসমানের বিয়ে দিলেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পর (৬৩১ খ্রিস্টাব্দে) কোনও এক রোগে হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-র মৃত্যু হয়। তাঁর কোনও সন্তান ছিল না।

হযরত ফাতিমা (রা.)

তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। (৬২৪ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর বিবাহ হযরত আলী (রা.)-র সঙ্গে হয়েছিল। তাঁর ছয় সন্তান হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে দুইজনের শিশুকালে মৃত্যু হয়েছিল। যে চারজন জীবিত ছিলেন তারা খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের নাম:

হযরত হাসান বিন আলী, হযরত হোসাইন বিন আলী, হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী, হযরত উম্মে যয়নাব বিনতে আলী। কোনও এক রোগে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত ফাতিমা (রা.)-র মৃত্যু হয়।

● হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ২৫ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ হযরত খাদিজা (রা.)-র সঙ্গে (৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে) হয়েছিল। হযরত খাদিজার মৃত্যু হয়েছিল ৬১৮ খ্রিস্টাব্দে। হযরত খাদিজা (রা.)-র মৃত্যুর পর পয়গম্বর (সা.) নিজের ছোট ছোট কন্যাদের দেখাশোনার জন্য হযরত সাওদা (রা.)কে বিবাহ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘাঙ্গী ও বেশি ভারী ওজনের মহিলা ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.)-র মৃত্যুর পর হযরত

মুহাম্মাদ (সা.) চার বৎসর পর্যন্ত কেবল একজন স্ত্রীর (হযরত সাওদা (রা.) সঙ্গে ছিলেন।

● হযরত সাওদা (রা.)-র মৃত্যুর পর নবী (সা.) বিভিন্ন কারণে যেসব মহিলাদের বিবাহ করেছিলেন তাঁদের নাম হল:

হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত যয়নাব (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.) হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.), জুওয়াইরিয়া (রা.), হযরত সুফিয়া (রা.), হযরত রেহানা (রা.) ও হযরত মায়মুনা (রা.)

● হযরত যায়েদ (রা.) হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর গোলাম ছিলেন। তিনি যায়েদকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মাদ নামে ডাকা হত। কিন্তু ঈশ্বর প্রকৃত পিতার স্থলে অন্যজনকে স্থলাভিষিক্ত করতে নিষেধ করলেন। তখন থেকে তিনি যায়েদ বিন হারিস নামে পরিচিত হতে লাগলেন। তাঁর এক পুত্র ছিল যার নাম ছিল উসামা। এই দুই পিতা-পুত্রকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) খুব ভালোবাসতেন। এবংএঁরা পয়গম্বরের পরিবারের সদস্যতুল্য ছিলেন।

****

৩. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পয়গম্বর হওয়ার পূর্বের জীবন

বর্তমান যুগে স্কুলে ভালো পড়াশুনার জন্য বাচ্চাদের বোর্ডিয়ে রাখা হয়। সেই যুগে বাচ্চাদের গ্রামে পাঠানো হত যাতে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাচ্চারা থাকতে পারে। ভাষা ভালো হবে। বাচ্চা পরিশ্রমী ও সাহসী হবে।

এইজন্য চার বৎসর বয়স পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হযরত হালিমার কাছে গ্রামে ছিলেন।

● যখন তাঁর ছয় বৎসর বয়স তখন তাঁকে নিয়ে তাঁর মা আমিনা মদীনায় পিত্রালয়ে যান। সেখানে তিনি একমাস থাকেন। তারপর মক্কা ফিরে আসার পথে আবুওয়ার নিকট হযরত আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবংসেখানে ৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সেবিকা উম্মে আয়মান তাঁদের সঙ্গে ছিল। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে মক্কায় নিয়ে আসেন এবংতাঁকে তাঁর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের হাতে সমর্পণ করেন।

● তাঁর পিতামহ তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে খুবই আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে লালনপালন করেন। কিন্তু যখন তাঁর আট বৎসর বয়স হল তখন ৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল মুত্তালিব মারা যান।

● মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল মুত্তালিব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে তাঁর নিজের চাচা আবু তালিবের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। হযরত আবু তালিবও মুহাম্মাদ (সা.)কে নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভালোবাসতেন এবং৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁকে দেখাশোনা ও রক্ষা করতে থাকেন।

● হযরত আবু তালিব ব্যবসায়ী ছিলেন। সিরিয়া ও মক্কার মধ্যে তিনি গম ও আতরের ব্যবসা করতেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গে থেকে ব্যবসার রীতিনীতি শিখে নিয়েছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সেই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তিনিও নিজেব্যবসা করতে শুরু করলেন।

● হযরত আবু তালিবের পরিবার বড় ছিল। খরচ বেশি ছিল। এজন্য তিনি মুহাম্মাদ (সা.)কে ব্যবসা করার জন্য খুব বেশি পুঁজিদিতে পারেননি। এজন্য তিনি অংশীদারিত্বের সঙ্গে ব্যবসা করতে লাগলেন। পরিশ্রম এবংদৌড়ঝাঁপ ও ব্যস্ততার মধ্যে থাকতেন, পুঁজিঅন্য জনের। মুনাফা দু'জনে ভাগ করে নিতেন।

স্বভাবগত দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী এবংপ্রতিশ্রুতি পালনে নিষ্ঠাবান। এইজন্য লোকেরা তাঁকে আল-আমীন (সত্যবাদী) বলে ডাকতো। এবংতাঁর সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা করতে সবাই ইচ্ছুক ছিল।

● হযরত খাদীজা (রা.) একজন নিতান্তই সৎ, বুদ্ধিমতী এবংধনী মহিলা ছিলেন। তিনি নিজেবাণিজ্যিক সফর করতেন বটে, কিন্তু লোকেদের মধ্যে পুঁজিবিনিয়োগ করে অংশীদারী ব্যবসা করতেন।

যখন তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ঈমানদারী, সত্যবাদীতা এবংবুদ্ধিমত্তার কথা

শুনলেন তখন তাঁকেও ব্যবসার মালপত্র দিয়ে খাদীজা নিজের গোলাম মায়সারাকে তাঁর সঙ্গে সিরিয়ায় পাঠালেন। তাঁর এই বাণিজ্যিক সফর খুবই লাভজনক হয়েছিল। হযরত খাদীজা (রা.)-র থেকে অনেক বেশি লাভ হয়েছিল।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে লোকেরা এতটাই তো জানত যে, তিনি নিতান্তই পবিত্র, সত্যবাদী, ঈমানদার এবংওয়াদা পালনকারী। এজন্য লোকেরা তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন' নামে ডাকতো। কিন্তু যে লোকেরা তাঁর সঙ্গে রাতদিন থাকতো তারা এটাও জানতে পারত যে, তাঁর সঙ্গে বহু বিচিত্র ঘটনাও ঘটতো। যেমন তিনি যখন কোনও গাছের নীচে বসতেন তখন তাঁর গায়ে রোদ লাগলে গাছের ডাল তাঁর দিকে নিজেথেকেই ঝুঁকে যেত এবংতিনি ছায়া পেতেন। যখন তিনি প্রখর তাপে মরুভূমির বুকে চলতেন তখন কোনও অদৃশ্য শক্তি তাঁর মাথার উপর ছায়াদান করতো। তাঁর ঘামে কোনও দুর্গন্ধ ছিল না ইত্যাদি। হযরত খাদীজা (রা.)-র গোলাম মায়সারা খাদীজা (রা.)কে এসব কথা বলেছিল।

● হযরত খাদীজা (রা.) মাত্র ৪০ বৎসর বয়স্কা ছিলেন। কিন্তু এই কম বয়সের মধ্যে তিনি তিনবার বিধবা হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর জীবনে এক নিঃসঙ্গতা বিরাজকরছিল। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সততা, ঈমানদারী, সম্মানীয় বংশ এবংএই ঐশ্বরীক সুরক্ষা যখন দেখলেন তখন খাদীজার মনে এক সুখী ও সম্পূর্ণ জীবনের স্বপ্ন জেগে উঠল এবংনিজের বান্ধবী নাফীসার মারফতে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। হযরত খাদীজার পিতারও মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তাঁর চাচা আমরু বিন আসাদ, হযরত মুহাম্মাদের চাচা আবু তালিব ও হযরত হামযা একত্রে পরামর্শ করে তাঁদের দু'জনকে ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বিবাহ দিলেন।

এরপর তিনি ১৫ বৎসর যাবৎ মানুষের মধ্যে একজন উত্তম স্বামী, উত্তম পিতা এবংসমাজের সুখ-দুঃখের প্রতি সহানুভূতিশীল আদর্শ পুরুষরূপে বিরাজমান ছিলেন। পয়গম্বরদের এক আদর্শ মানুষরূপে সমাজের মধ্যে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাখা—এটা আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম।

এর উপকারিতা হল এই যে, যখনই এই আদর্শ-মানুষ বলে—আমি আল্লাহর পয়গম্বর তখন জনগণ অবগত থাকে যে, এই ব্যক্তি জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি, সুতরাংতিনি আজও সত্য কথা বলছেন। যখন পয়গম্বর বলেন যে, অসহায়কে সাহায্য কর, তখন লোকেরা একথা বলতে পারে না যে, নিজেতো ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত লোকেদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে এসেছেন, আর এখন আমাদের ন্যায়ের শিক্ষা দিচ্ছেন। অর্থাৎ তারা পয়গম্বরকে, তাঁর বংশকে, তাঁর আচরণকে, তাঁর সমস্ত কিছুকে উত্তমরূপে জানে। তাঁকে না মানার জন্য তাঁর মধ্যে কোনও দোষ বের করতে পারে না।

এমনটাই হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সঙ্গে। মক্কার অধিবাসীরা তাদের শিক্ষার অহঙ্কার, দম্ভ, হঠকারিতা ও জিদের বশবর্তী হয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে মেনে নিলেন না। কিন্তু তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)এর আচরণের উপর কোনও আঙ্গুল উঠাতে পারেনি। তারা মানতে বাধ্য হয়েছিল যে, তিনি একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। (সীরাতে আহমাদ মুজতাবা সা.)।

৪. হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পয়গম্বর হওয়ার পরের জীবন

৩৭ বৎসর বয়স থেকে ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.) রাত্রে সত্য স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর মন চাইত, লোকদের থেকে দূরে একাকীত্বে এক ঈশ্বরের স্মরণে মগ্ন থাকতে। এবংতিনি ঘর থেকে কয়েকদিনের জন্য খাদ্য-পানীয় সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের শিখরে হেরা নামক এক গুহায় চলে যেতেন এবংআল্লাহর স্মরণ করতে থাকতেন।

(মক্কার লোকেরা এক আল্লাহকে মানতো কিন্তু সেইসঙ্গে আরও অনেক দেবদেবীর পূজাও করত। পৃথিবীতে এই মূর্তিপূজাকে বন্ধ করার জন্যই আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে পয়গম্বর বানিয়েছিলেন।)

এই হেরা গুহায় ঈশ্বরকে স্মরণ করার সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে ঈশ্বর হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে জানালেন যে, তিনি একজন পয়গম্বর এবংমানুষকে পথ প্রদর্শন করা তাঁর দায়িত্ব। তখন তাঁর বয়স ৪০ বৎসর। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৪০ বৎসর বয়স থেকে ৬৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩ বৎসর যাবৎ মানুষের মাঝে ঈশ্বরের সুসংবাদ (বাণী) পৌঁছাতে থাকেন।

২৩ বৎসরের এই সময়কালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে বুঝতে অনেক মানুষ ভুল করে বসে। তাঁর জীবনকে ভালো করে বোঝার জন্য তাঁর ২৩ বৎসরের পয়গম্বরীর জীবনকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে।

● ৪০ বৎসর বয়সে ঈশ্বর তাঁকে ধর্মের জ্ঞান শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এবংপরবর্তী ২৩ বৎসর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। প্রথম তিন বৎসর কেবল তাঁর নিজের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করার অনুমতি ছিল। এই তিন বৎসর ধর্মপ্রচারের ফলে মাত্র ৪০ জন লোক মুসলমান হয়েছিল।

● চতুর্থ বর্ষে (৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে) সাধারণ জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করার আদেশ প্রাপ্ত হলেন। মূর্তিপূজা না করার শিক্ষা লোকদের পছন্দ হল না। গোটা শহর তাঁর শত্রু হয়ে গেল।

● পঞ্চম বৎসর থেকে ১৩ বৎসর পর্যন্ত তিনি মক্কাতেই ছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুসরণকারীদের উপর কঠিন নির্যাতন শুরু হয়ে গেল। সেজন্য তারা মক্কা শহর ছেড়ে চলে গেল। তারা সংখ্যায় ছিল ৮০ জন।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গোত্র ছিল খুবই সম্মানিত ও শক্তিশালী। তাঁর গোত্রের বহু লোক মুসলমান হয়নি, তা সত্ত্বেও তারা তাকে সুরক্ষা দান করত। মক্কাবাসীরা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে উত্যক্ত করার সুযোগ পেল না তখন তারা তাঁর পুরো গোত্রকেই সামাজিকভাবে বয়কট ও বহিষ্কার করল (অক্টো: ৬১৫-সেপ্টে: ৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)। এই তিন বৎসর তাঁর পুরো গোত্রের জন্য খুব কঠিন সময় ছিল।

● তিন বৎসর পর এই সামাজিক বয়কট

শেষ হল, কিন্তু এই বছরে (৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে) তাঁর সম্মানীয়া স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) এবংপ্রিয় চাচা হযরত আবু তালিবের মৃত্যু হয়।

● হযরত আবু তালিবের পর তাঁর গোত্রের সরদার হল আবু লাহাব। এ ছিল পয়গম্বর (সা.)-এর পাক্কা দুশমন। সে নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা.)কে সুরক্ষা দান করতে অস্বীকার করল। মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বিপদ-মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল।

মক্কার প্রতি হতাশ হয়ে তিনি (জুন, ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে) মক্কার অদূরবর্তী শহর তায়েফে গমন করলেন এবংওখানে ধর্মপ্রচার করতে চাইলেন। কিন্তু তায়েফবাসীরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করল। তাঁর উপর এতো পাথর বর্ষণ করা হল যে, তিনি ঘোরতরভাবে আহত হয়ে পড়লেন।

● স্ত্রী ও চাচার মৃত্যু। মক্কার প্রতিটি মানুষ তাঁর শত্রু। তায়েফে অসফলতা। এইসব কারণে তিনি খুবই দুঃখ পেলেন। তখন আল্লাহ হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে জুলাই ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে রাত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে এক ঐশী ঘোড়ার (যার নাম বুররাক) পিঠে সওয়ার করিয়ে জেরুসালেমে নিয়ে আসলেন। তারপর সেখান থেকে আল্লাহ তাঁকে আসমানে ডেকে নিলেন এবংস্বর্গলোক ভ্রমণ করালেন। মৃত্যুর পর কি পরিণতি হবে তিনি সেসব নিজের চোখে দেখলেন। এর ফলে তাঁর মনোবল অনেক বৃদ্ধি পেল এবংতাঁর মধ্যে হতাশা কমে গেল।

● আরবের লোকেরা তো মূর্তিপূজা করত, কিন্তু এ সত্যকে জানতো যে, এই সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। এবংহযরত ইবরাহীম (আ.) যে হজের বার্তা দিয়েছিলেন তারা এই হজও করত।

হজের সময় সমগ্র আরবের মানুষ মক্কায় একত্রিত হত, এই সুযোগে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে আল্লাহর সত্যধর্ম সম্পর্কে বলতেন। ইহুদী এবংখ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে একজন পয়গম্বর আসার ভবিষ্যৎবাণী ছিল। আর তারা এই পয়গম্বরের অপেক্ষায় ছিল। তারা আরববাসীদের হুমকি দিত এই বলে যে, 'ওই পয়গম্বর আগমনের পর আমরা আরও শক্তিশালী হবো এবংতোমাদের সবাইকে পরাজিত করে দেবো।'

এজন্য আরববাসীরাও জানতো যে, একজন পয়গম্বর আসার কথা আছে। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মদীনার কয়েকজন হজযাত্রী যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা শুনলো তখন তারা চিনতে পারলো যে, তিনিই সেই পয়গম্বর যাঁর আগমনের প্রসঙ্গে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা চর্চা করত। তারা মুসলমান হয়ে গেল। তারা ছিল ছয়জন। পরের বছর ৬২১ খ্রিষ্টাব্দের হজের সময় মদীনার ৭৫ জন লোক মুসলমান হয়। তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে ধর্ম শেখার জন্য একজন শিক্ষক চাইলেন। তখন তিনি হযরত মুস'আব বিন আমীর (রা.)কে তাদের সঙ্গী বানিয়ে দিলেন। হযরত মুস'আব (রা.) মদীনা গেলেন এবংতাঁর ধর্ম প্রচারের ফলে মদীনায় বহু মানুষ মুসলমান হয়ে গেল।

● কাবা শরীফে ৩৬০টি মূর্তি রাখা ছিল। এগুলি দর্শনের জন্য সারা বছর ধরে মানুষ আসতে থাকে এবংএতে মক্কাবাসীদের ব্যবসা চলতে থাকে। এজন্য যখন মক্কার

লোকেরা মদীনায় ইসলাম প্রসারিত হওয়ার খবর পেল তখন তারা খুব ক্রোধান্বিত হল এবংহযরত মুহাম্মদ (সা.)কেই খতম করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। যখন মুহাম্মদ (সা.) তাদের উদ্দেশ্য ও মতিগতি জানতে পারলেন তখন তিনি ১২ কিংবা ১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যরাত্রে মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলেন। এটা তাঁর পয়গম্বরীর ত্রয়োদশ বৎসর ছিল। এই ঘটনাকে হিজরত বলা হয়। এই ঘটনার পর থেকে হিজরী সনের আরম্ভ হয়।

● মক্কাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবংআরও দু'চারজন মুসলিমরা ছাড়া বাকি সবাই মূর্তিপূজক ছিল। এজন্য মক্কাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমস্ত শিক্ষা নিতান্ত বুনিয়াদী ও প্রাথমিক ছিল। অর্থাৎ 'এই জগৎ সংসারের স্রষ্টা কেবল এক ঈশ্বর, তাই সেই এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারও সামনে মাথা নত করো না।' কিন্তু মদীনাতে অনেক বেশি লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবংঅন্য শহর থেকেও মুসলমানরা এসে এখানে আশ্রয় নিচ্ছিল। তার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পয়গম্বরীর চতুর্দশ বৎসরে মদীনাতে কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবংএকটা ইসলামী সমাজপ্রতিষ্ঠা করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মদীনায় চলে আসলেন এবংসেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকলো তখন মক্কাবাসীরা মদীনা থেকেও মুসলমানদের বহিষ্কার করার উদ্যোগ নিল, যুদ্ধের খরচ ওঠানোর জন্য তারা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করল। মক্কা শহরের প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যবসার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করবে এবংব্যবসায়ে যে মুনাফা হবে তা থেকে যুদ্ধ তহবিলে দান করবে।

পয়গম্বরীর পঞ্চদশ বৎসর

মক্কাবাসীরা সিরিয়া এবংইয়েমেনের মধ্যে ব্যবসা করত। মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে মদীনা শহর। তাদের পরিকল্পনা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) জেনে ফেললেন তখন তিনি মক্কাবাসীদের সিরিয়ায় ব্যবসা করে অর্থ অর্জন করে মদীনা আক্রমণ করার পূর্বেই তাদের সিরিয়া যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিতে চাইলেন। ফলে মক্কাবাসীরা বুঝে গেল যে, এখন থেকে তারা আর সিরিয়ায় নিরাপদে ব্যবসা করতে পারবে না।

মক্কার লোকেরা জানতো যে, সিরিয়া থেকে আগত বাণিজ্য দলের জন্য মদীনা বিপদজনক। এজন্য সিরিয়া থেকে আগত এক বাণিজ্য কাফেলার রক্ষার জন্য তারা ১৩০০ সৈনিক প্রেরণ করেছিল।

যখন বাণিজ্যদল মদীনার পাশ দিয়ে আসা রাস্তা বদল করে নিরাপদে মদীনা অতিক্রম করে গেল তখন কেবল ৩০০ জন সৈনিক মক্কায় ফিরে আসলো। অবশিষ্ট ১০০০ সৈনিকের আকাঙ্খা ছিল মদীনা আক্রমণ করার। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেবল ৩১৩ জন সঙ্গী নিয়ে বদরের ময়দানে তাদের প্রতিরোধ করলেন এবংবিজয়ী হলেন। এই ঘটনা তাঁর পয়গম্বরীর পঞ্চদশ বৎসরে সংঘটিত হয়।

পয়গম্বরীর ষোড়শ বৎসর

মক্কাবাসীরা যুদ্ধের জন্য ব্যবসা থেকে অর্থ তহবিল পূর্বেই সংগ্রহ করে নিয়েছিল এবংইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিল। বদর যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানিও মেটাতে চাচ্ছিল তরা। আর তাই তারা ৩০০০ সৈনিক

সহযোগে মদীনার উপর আক্রমণ চালিয়ে দিল। ওহুদের ময়দানে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। নিজেদের ভুলের কারণে মুসলমানরা প্রথমে বিজয়ী হওয়ার পর পুনরায় পরাজিত হল এবংতাদেরকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল।

পয়গম্বরীর অষ্টাদশ বৎসর

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য গোটা আরব থেকে দশ হাজার সৈনিক একত্রিত হয়ে মদীনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকলকে একসঙ্গে মুকাবিলা করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এজন্য তারা শহরের সীমায় পরিখা খনন করে নিজেদের রক্ষা করল।

এই যুদ্ধ একমাস যাবৎ চলতে থাকে। কিন্তু আক্রমণকারীরা পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হল না। পরিশেষে ঈশ্বরের তরফ থেকে তীব্র ঝড়-তুফান ধেয়ে আসলো এবংতাদের তাঁবুগুলোকে উপড়ে দিল এবংশত্রুরা বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে চলে গেল।

যদি তারা সফল হত, তাহলে একজনও মুসলমান জীবিত থাকত না, আর না এই অন্তিম আলোকবর্তিকা (কুরআন) প্রজ্জ্বলিত থাকত।

এই ঘটনা ঘটেছিল তাঁর পয়গম্বরীর অষ্টাদশ বৎসরের মার্চ মাসে, সন ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে। এই যুদ্ধের বর্ণনা অথর্ববেদে (২০:২১:৬) এইভাবে করা হয়েছে।

से त्वा अमदन तानि वृष्णया ते सोमासो वृत्रया ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्यतें

यत कारवे दश वृत्राायपति वर्हिष्मते नि सहस्रानि बर्हयल।

ভাবার্থ: সত্যপন্থী বীরগণ ঈশ্বরের বন্দনা গীত গাইতে গাইতে বীরত্বের সঙ্গে দশ হাজার শত্রু সেনাকে বিনা যুদ্ধে পরাজিত করল। (Mohammed in World Scripture by A. H. Vidyarthi: Page No. 118)

● যখন গোটা স্তরব জোটবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথীরা এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা অসহায় ছিলেন। তাঁরা আরবের প্রত্যেকটা ঠিকানায় গিয়েও তাদের প্রতিরোধ করতে পারত না। এজন্য পরিখা খনন করে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন। এবার তো কোনও রকমে বেঁচে গেল। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, এরপর শত্রুরা আরও অধিক সংখ্যায় এসে আক্রমণ করল, আর মুসলমানরা পরিখা খনন করতে পারল না। এজন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। যখনই কোথাও শত্রুসৈন্যের একত্রিত হওয়ার খবর পেতেন তৎক্ষণাৎ তাঁর সাথীদের সেখানে পাঠিয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। এরকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

পয়গম্বরীর উনিশতম বৎসর

এক রাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি উমরাহ করছেন। উমরাহতে কাবা শরীফ এবংসাফা-মারওয়া পরিক্রমা করতে হয় এবংমস্তক মুণ্ডন করতে হয়। যখন তিনি তাঁর সাথীদেরকে এই স্বপ্নের কথা বললেন, তখন সকলের হৃদয় তাদের

পূরাতন শহর মক্কা এবংঈশ্বরের ঘরকে দেখার জন্য উদ্বেল হয়ে ওঠে।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং১৪০০ মুসলমান উমরাহ করার বাসনায় মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাদেরকে মক্কা শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল না এবংযুদ্ধে নেমে পড়ল। অনেক আলাপ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটা শান্তি সন্ধি চুক্তির ভিত্তিতে সহমত হল এবংমীমাংসা করে নিল। এই সন্ধিকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বলা হয়।

এই সন্ধিতে এই কথাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে যে, দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে এবংএকে অপরের বন্ধু গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। এবংহযরত মুহাম্মদ (সা.) আগামী বৎসর উমরাহর জন্য আসবেন (এ বৎসর নয়)। এই ঘটনা পয়গম্বরীর ১৯তম বৎসরে সংঘটিত হয়েছিল।

পয়গম্বরীর বিশতম বৎসর

আরবদেশে ইহুদীরা খুব সম্পদশালী ও শিক্ষিত ছিল। তারা নিজেদেরকে আরববাসীদের থেকে অনেক বেশি মর্যাদাবান মনে করত। কিন্তু যখন ইসলাম আসল তখন তাদের বড়ত্ব শেষ হয়ে গেল। এজন্য তারা মুসলমানদের খুব ঘৃণা করত। আর আরববাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিত। ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে আরববাসীদের মুক্ত রাখার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ১৪০০ উমরাহওয়ালা সাথীদের নিয়ে ইহুদীদের খায়বার দুর্গ অবরোধ করলেন। তারা পরাজয় স্বীকার করে নিল এবংএক শান্তি সন্ধিতে স্বাক্ষর করল।

সন্ধি স্থাপনের পর তারা মুসলমানদের এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ করল এবংখাবারে বিষ মিশ্রিত করে দিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একজন সাথী খাবারের একটা গ্রাস মুখে নিল এবংতার মৃত্যু হয়ে গেল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) গ্রাস মুখে নিয়ে ফেলে দিলেন। তা সত্ত্বেও বিষের কিছুটা প্রভাব তাঁর উপর পড়ল। এরপর তিনি ৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। মাঝে মাঝে এই বিষের প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন এবংপরিশেষে এই বিষের প্রভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। (সহীহ বুখারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৯৫, ১৫৫৪)। এই ঘটনা পয়গম্বরীর বিশতম বৎসরে ঘটেছিল।

● মক্কাবাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সবসময় পেরেশান করে রাখত। এটা একটা মাথা ব্যথার কারণ ছিল। তাদের সঙ্গে হুদাইবিয়ার সন্ধি হওয়ার পর একটা শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবের বাইরের দেশে শাসকদের কাছে ধর্ম প্রচারের জন্য পত্র লেখা শুরু করলেন। রোম, ইরান, মিশর, ইথিওপিয়া, ইয়েমেন এবংসিরিয়ার শাসকদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। রোমের বাদশা তাঁর পয়গম্বরীকে মেনে নিলেন কিন্তু মুসলমান হলেন না। ইরানের বাদশা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবংপত্র ছিঁড়ে ফেললেন। মিশরের বাদশা তাঁর পত্রবাহককে খুবই খাতির-যত্ন করলেন এবংউপহার প্রদানপূর্বক বিদায় করলেন।

ইয়েমেনের বাদশা লেখেন, যদি আপনি রাজত্ব করার ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করেন তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব। ইসলাম রাজত্ব করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি।

এজন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শর্ত প্রত্যাখ্যান করলেন।

ইথিওপিয়ার বাদশা মুসলমান দূতকে খুবই সম্মান করলেন এবংমুসলমান হয়ে গেলেন। সিরিয়ার সীমানায় শারজীল বিন আমরু নামে এক সরদার রাজত্ব করত। সে রোমান শাসকদের অধীন ছিল। সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পত্র পাঠ করে খুবই ক্রোধান্বিত হল এবংমুসলমান দূতকে হত্যা করল। সেইসঙ্গে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তার সৈন্যদের উপর নির্দেশ জারি করল।

শারজীল বিন আমরুকে নিবৃত্ত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু শারজীল প্রথম থেকেই আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তাই সে দুই লক্ষ সৈন্য জমা করল। দু'লক্ষ সৈন্যের সামনে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য, কিন্তু তারা সাহস হারায়নি। যুদ্ধ শুরু হল। মুসলমানদের তিনজন সেনাপতি পরপর শহীদ হয়ে গেলেন। পরের দিন সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। তিনি তিন হাজার সৈন্যকে এমনভাবে দণ্ডায়মান করালেন যে, এমন দেখতে লাগছিল যেন গতকালের আহত সৈনিক নয় বরংআজকের সব নতুন সৈনিক দণ্ডায়মান হয়েছে। তারপর তিনি নিজের সৈন্যদের পিছনে হটিয়ে আনতে শুরু করলেন। রোমানরা মনে করল, এটা মুসলমানদের এক কৌশল, এরা আমাদেরকে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে লড়তে চাইছে। ফলে তারা অগ্রসর হল না এবংমুসলমানরা নিরাপদে ফিরে আসল। এমনটা ঘটেছিল মুতা নামক স্থানে। আজও সেখানে শহীদদের স্মারক বর্তমান রয়েছে।

পয়গম্বরীর ২১তম বৎসর (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

মক্কার অধিবাসীদের সঙ্গে তো শান্তি সন্ধি হয়েছিল, কিন্তু তারা এই সন্ধির শর্তাবলী পালন করছিল না। মক্কা শহরকে ঈশ্বর শান্তি ও নিরাপত্তার শহররূপে তৈরী করেছেন। এই শহরে গাছ-গাছালি কাটা নিষিদ্ধ। পশুপাখি হত্যা করাও নিষেধ। যদি কোনও ব্যক্তি অন্য কোনও স্থানে অপরাধ করে এবংমক্কায় এসে যায়, তাহলে যতক্ষণ না সে মক্কার বাইরে চলে যায় ধর্মীয় বিধি অনুসারে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই অপরাধীকেও মক্কা শহরের সীমার মধ্যে মারা নিষেধ। অর্থাৎ মক্কা একটি শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়ের শহর। কিন্তু মক্কার বাসিন্দারা এমন কোনও ধর্মীয় নিয়ম পালন করেনি, হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর সঙ্গে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির প্রতি কোনও গুরুত্ব দিল না। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বন্ধু গোত্রের যেসব লোক মক্কায় এসেছিল তাদের সবাইকে কাবা শরীফের সামনে হত্যা করে দিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বার্তা পাঠালেন হয় এই হত্যাকাণ্ডের জরিমানা আদায় কর, অন্যথায় শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে দাও। তখন মক্কাবাসীরা দর্পভরে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে দিল।

● শান্তি সন্ধি ভঙ্গ হওয়ার পর মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা ছিল। তারা আক্রমণ করার পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) দশ হাজার সৈন্যসহ মক্কা শহর অবরোধ করলেন। মক্কাবাসীরা এই আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তারা পরাজয় স্বীকার করে

নিল। এই ঘটনা পয়গম্বরীর ২১তম বৎসরের ঘটনা।

● মক্কাবাসীরা ২১ বৎসর যাবৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে এসেছে। হত্যা করার চেষ্টা করেছে। মুসলমানদের যন্ত্রণা দিয়েছে। তিনবার মদীনা আক্রমণ করেছে। মুসলমানদের প্রতি তাদের কৃত অপরাধ অগণিত। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন পুরোপুরিভাবে মক্কা শহরকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিলেন তখন তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। এই ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনে মক্কার মানুষরা এতটা প্রভাবিত হয়েছিল যে, তারা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিল।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য ছিল। বিজয়প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি কারও কোনও ক্ষতি করেননি। এইজন্য অথর্ববেদের ভবিষ্যৎ বাণীতে তাদেরকে গাভী নামে স্মরণ করা হয়েছে।

एश इशाय मामहे शतं निष्कान् दश
त्रीणि शतान्यर्वतां सह सरत्रादश गोनाम।।

ভাবার্থ : ঈশ্বর মামহে ঋষিকে ১০০ হার, ১০ স্বর্ণমূদ্রা, ৩০০ ঘোড়া এবং১০ হাজার গাভী দান করবেন।

এই শ্লোকে ১০০ হার 'আসহাবে সুফ্ফা'দেরকে বলা হয়েছে ১০ স্বর্ণমূদ্রা 'আশারা মুবাশশারা' (এই লোকরা পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় স্বর্গের সুসংবাদ পেয়েছিলেন)কে বলা হয়েছে। ৩০০ ঘোড়া সেইসব সৈনিকদের বলা হয়েছে যারা বদর যুদ্ধে লড়াই করেছিল। এবংদশ হাজার গাভী ওইসব সৈনিকদের বলা হয়েছে যাঁরা গাভীর মতো, অন্য কারো ক্ষতি করে না।

त्वमेतां जनराज्ञी द्विर्दशावन्युना
सुश्रवसोपजग्मुष।

षष्टि सहसा।
नबर्ति नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या
दुष्टदाबूराक।।१।।

অন্য শ্লোকে ঈশ্বর বলেছেন– তিনি আপনাকে ৬০,০৯৯ জন শত্রুর কবল থেকে বাঁচাবেন। এই ৬০,০৯৯ জন দুশমন ছিল মক্কাবাসীরা। (ওই সময় মক্কার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার) (Mohammed in world scripture, Page No. 127. Atharva Veda-20:21:3)

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহসা মক্কা শহর অবরোধ করেছিলেন। এজন্য মক্কাবাসীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারেনি এবংপরাজিত হয়। কিন্তু আশেপাশের গোত্রগুলো মক্কা আক্রমণ দেখে সাবধান হয়ে গেল। যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তারা সময় পেয়েছিল। ফলে তারা ১২ হাজার সৈনিকের এক সেনাদল প্রস্তুত করে নিল এবংআক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

● হুনাইনের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। মক্কাবাসীরা খুব বাহাদুরির সঙ্গে লড়াই করল কিন্তু পরাজিত হল। হযরত মুহাম্মদ সা. তাদের পরাজিত ও বন্দি করার পর পুনরায় সকলকে ক্ষমা করে দিলেন এবংমুক্ত করে দিলেন।

এই দয়া উদারতা প্রদর্শনে তাদের হৃদয় গলে

গেল এবংতারা সবাই মুসলমান হয়ে গেল। এইভাবে গোটা আরব ভূখণ্ডের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতার সমাপ্তি হল।

পয়গম্বরীর ২২তম বৎসর

গোটা আরব ভূখণ্ড যখন মুসলিম হয়ে গেল তখন রোম নিজের জন্য বিপদের আশংকা করতে শুরু করল। তারা এক বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ শুরু হয়ে গেল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন এই খবর জানলেন, তখন তাদের আক্রমণ করার পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে ২০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তাদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন।

রোমের দুই লক্ষ সৈন্য মু'তায় ৩ হাজার মুসলিম সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তারা জানত যে, কেবল ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে ওরা ২ লাখ সৈন্যের সঙ্গে টক্কর দিতে ভয় পায়নি এবংএকদিন যুদ্ধ করে পিছনে সরে গিয়েছিল। আর এখন তো ওরা ৩০ হাজার আর ওদের পয়গম্বরও ওদের সঙ্গে রয়েছেন। ফলে রোমানরা মুকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেলল এবংআশেপাশের গ্রামে আত্মগোপন করল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) একমাস যাবদ তাবুকের ময়দানে অপেক্ষা করলেন এবংযুদ্ধ না করে ফিরে গেলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল পয়গম্বরীর ২২তম বৎসরে।

এইভাবে গোটা আরব দেশে শান্তি স্থাপিত হয়ে গেল এবংঅধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল।

পয়গম্বরীর ২৩তম বৎসর

পয়গম্বরীর ২২তম বৎসরে আল্লাহ মুসলমানদের উপর হজফরয করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোনও কারণে তখন হজকরতে পারেননি। এজন্য ২৩তম বৎসরে তিনি হজেযাওয়ার ঘোষণা দিলেন। পয়গম্বর (সা.)-এর কাছ থেকে হজশেখার জন্য এবংতাঁর সঙ্গে হজকরার সৌভাগ্যপূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য গোটা আরব থেকে এক লাখ চল্লিশ হাজার মুসলমান মক্কায় জমায়েত হলেন এবংতাঁর সঙ্গে হজকরলেন।

হজের ময়দানে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত। এই ভাষণের প্রধান উপদেশাবলী আমি সপ্তম অধ্যায়ে পেশ করব।

● মক্কা তাঁর জন্মস্থান ছিল। তিনি মক্কা শহরকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। হজথেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় মক্কা ছাড়ার প্রাক্কালে তিনি খবুই কষ্ট অনুভব করেছিলেন এবংতাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হতে শুরু করল।

● মদীনা ফিরে যাওয়ার ৭৫ দিন পর তাঁর মাথা যন্ত্রণা ও জ্বর শুরু হল। এটা সেই বিষের প্রতিক্রিয়া যা ইহুদীরা তাঁর উপর প্রয়োগ করেছিল। তিনি ৭৫ দিন অসুস্থ ছিলেন এবং৮ জুন, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেহাবসান হয়।

● পৃথিবীতে তিনি ৬৩ বৎসর ছিলেন। তাঁর জীবন অধ্যয়ন করলে আমরা অনুভব করতে পারি যে, সুখ-শান্তির যে কয়টি বছর তিনি পেয়েছিলেন তা ছিল পয়গম্বর হওয়ার পূর্বের কয়েকটি বছর। সেই কয়েকটি বছর ছাড়া তাঁর সারা জীবনটাই ছিল এক নিরন্তর

সংঘাত ও সংঘর্ষের।

● জন্মের পূর্বে পিতার মৃত্যু হয়। ছয় বৎসর বয়সে মায়ের মৃত্যু হয়। ৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত এমন এক পরিবারের সদস্য ছিলেন যে পরিবার স্বচ্ছল ছিল না। পয়সার জন্য তিনি মরুভূমিতে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছেন এবংচাচার সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মরুপথে দূর-দূরান্তে সফর করেছেন।

● পয়গম্বরীপ্রাপ্ত হওয়ার পর ধর্ম প্রচারের কাজখুবই কঠিন ছিল। যখন কুরআন অবতরণ হত তখন এতোটা কষ্ট হত যে প্রচণ্ড শীতের সময়ও তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন।

● ধর্মের দু'টি কথা শুনলেই মিত্র শত্রু হয়ে যাচ্ছিল।

● তাঁর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর লোকেরা এতটা পেরেশান করত যে, তিনি ঘর থেকে বের হওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন। কেউ গালি দিত, কেউ গায়ে থুথু দিত, কেউ বলত পাগল, কেউ বলত যাদুকর, কেউ মাথার উপর মাটি ফেলে দিত, কেউ রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রাখত, কেউ কাপড় ছিঁড়ে দিত। তিনি বলেছিলেন– 'এই পৃথিবীতে আমাকে যত নির্যাতন করা হয়েছে, অন্য কোনও পয়গম্বরকে ততটা নির্যাতন করা হয়নি। (মুসলিম, তিরমিযি)

পয়গম্বর হওয়ার সময় তাঁর কাছে ২৫ কিলোগ্রাম স্বর্ণমূল্যের সম্পদ ছিল। ধর্ম প্রচারে তিনি সব সম্পদ খরচ করে দিয়েছিলেন।

● যখন তিনি মদীনায় এলেন, তখন অন্য স্থান থেকে মদীনায় আগত গরীব মানুষদের খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা তিনি করতেন। তাদের সেবায় তিনি নিজের খাবারও তাদেরকে খাইয়ে দিতেন এবংতিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ অভুক্ত থাকতেন।

একটানা তিন মাস তাঁর ঘরে চুলো জলতো না। তিনি ও তাঁর পরিবারের সবাই শুধু খেজুর ও পানি দিয়ে জীবন বাঁচাতেন। (বুখারী, মুসলিম)

● পয়গম্বরীর দশম বৎসর থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনহানির আশংকা ছিল।

● মদীনায় আসার পর তিনি কখনো সারা দিনে দু'বেলা পেট ভরে খাননি। (বুখারী, মুসলিম)।

● মদীনায় আসার পর কখনো গমের রুটি খেতে পাননি, শুধু যবের রুটিতে দিন চালিয়ে নিতেন। (বুখারী, মুসলিম)

● থাকার জন্য একাট কাঁচা বাড়ি ছিল। বস্তা বা চাটাই বিছিয়ে শয়ন করতেন। আরাম আয়েশ করার কোনও উপকরণ বা দ্রব্য সামগ্রী তাঁর ঘরে ছিল না।

● লোকজন যখন তাঁর একেশ্বরবাদের উপর বিশ্বস স্থাপন করার উপদেশ মানতো না, তখন তিনি খুবই দুঃখ পেতেন। কেননা এমন মানুষদের একশো শতাংশই নরকে যাবে। কারও নরকে যাওয়া তাঁকে এতটা কষ্ট দিত যে, তিনি রাতের পর রাত আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন এবংকাঁদতে থাকতেন। বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে তাঁর পা ফুলে যেত।

● ঈশ্বর গোটা বিশ্বের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে পয়গম্বর রূপে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে মানুষের জন্য এতবেশি কল্যাণ কামনার তাড়না ছিল যে, ঈশ্বর যিনি তাঁকে

পয়গম্বর বানিয়ে এবংমানুষদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন, কুরআনে বলেছেন– এই কুরআন আমি এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে তুমি কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে। (পবিত্র কুরআন, ২০:২)

● ঈশ্বর এও বলেছেন, 'হে পয়গম্বর! সম্ভবত এই দুঃখে তুমি তোমার জীবন শেষ করে ফেলবে যে, এই লোকেরা ঈমান আনেনি।' (পবিত্র কুরআন ২৬:৩)

● ঈশ্বর তাঁর প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন।

****

৬. হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে বিদ্বানব্যক্তিদের অভিমত

মহাঋষি ব্যাসদেবের ভবিষ্যৎবানী

মহাঋষি শ্রী ব্যাসদেব হিন্দু ধর্মের সবথেকে বড় বিদ্বান (পণ্ডিত) ব্যক্তি। মহাভারতের প্রণেতা তিনি। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে আদেশ দিয়েছিলেন সেটাকেও পুস্তকের আকারে তিনিই লিখেছেন। এই পুস্তককে গীতা বলা হয়। চারটি বেদের শ্লোক এবংসুক্তের পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা তিনিই করেছেন। তিনি ১৭টি পূরাণ লিখেছেন। তার মধ্যে একটি পুরাণের নাম ভবিষ্য পুরাণ। পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে, ভবিষ্য পুরাণের জ্ঞান (কথা) ঐশী। ব্যাসদেব কেবল লিপিবদ্ধ করেছেন।

শ্রী ব্যাসদেব আজথেকে ৪০০০ বৎসর পূর্বে এসেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ সা. আজথেকে ১৪০০ বৎসর পূর্বে এসেছিলেন। শ্রী ব্যাসদেব হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্মের ২৫০০ বৎসর পূর্বে তাঁর আগমনের ভবিষ্যৎবানী পুরাণে লিখে দিয়েছিলেন।

ভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব-৩, অধ্যায়-৩, খণ্ড-৩ কলিযুগী ইতিহাস সমুচ্চয়তে ২৭টি শ্লোক ইসলাম ধর্ম এবংহযরত মুহাম্মদ সম্পর্কে রয়েছে। ওই ভবিষ্যৎবানীর সারাংশ নিম্নলিখিত:—

- ভারতবর্ষে মানুষ ধর্মের শিক্ষা (জ্ঞান) ভুলে যাবে।
- ভারত থেকে দূরবর্তী আবর দেশে (মরুভুমিতে) মুহাম্মদ সা.-এর জন্ম হবে।
- ঈশ্বর তাঁকে ব্রহমা উপাধি দান করবেন এবংতিনি মানব জাতিকে পুনরায় ধর্মশিক্ষা দান করবেন।
- ভারতবর্ষের আর্য ধর্মের সংশোধন হবে এবংসমস্ত মানুষ মুসলমান হবে।
- শ্রী ব্যাসদেব মহান আচার্য হযরত মুহাম্মাদের চরণে আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

ভবিষ্য পুরাণে বেশ কয়েকটি শ্লোকে হযরত মুহাম্মাদ সা. প্রসঙ্গে তাঁর নাম সহ ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। যেগুলির মধ্যে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে বর্ণিত হ'ল:-

(Ref. Muhammad in World Seripture by A H Vidyrthi. Page No. 35-43, Bhavishya Puran printed by Venkateshuar Press, Mumbai)

মহাকবি গোস্বামী তুলসিদাসের ভবিষ্যৎ বানী

পুরাণগুলির মধ্যে সংগ্রাম পুরাণকেও গণ্য করা হয়। এই পুরাণেও ঈশ্বরের অন্তিম দূত এবংপয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের পূর্ব সূচনা পাওয়া যায়। পণ্ডিত ধর্মবীর উপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অন্তিম ঈশ্বরদূত'-এ লিখেছেন, 'কাগভুসুন্ডী এবংগরুড় দু'জনে শ্রী রামচন্দ্রের সেবায় দীর্ঘদিন ছিল। তারা তাঁর উপদেশাবলী কেবল

শুনতে থাকেনি, বরংতারা মানুষদেরও শোনাচ্ছিল। এই উপদেশাবলীর আলোচনা তুলসিদাস তাঁর গ্রন্থ 'সংগ্রাম পুরাণের' অনুবাদেও করেছেন। এর মধ্যে শংকরদেব নিজের পুত্র ষন্মুখকে আগত ধর্ম এবংঅবতার (ঐশীদূত) সম্পর্কে পূর্ব সূচনা দান করেছেন। তার অনুবাদ এই রকম:—

यहा न पक्षपात कछु राखहुं।
वेद, पुराण, संत मत भाखहुं।।
संवत विक्रम दोऊ अनङ्गा।
महाकोक नस चतुर्पतङ्गा।।
राजनीति भव प्रीति दिखावै।
आपन मत सबका समझावै।।
सुरन चतुसुदर सतचारी।
तिनको वंश भयो अति भारी।।
तब तक सुन्दर महिकोया।
बिना महामद पार न होया।।
तबसे मानहु जन्तु भिखारी।
समस्थ नाम एहि व्रतधारी।।
हर सुन्दर निर्माण न होई।
तुलसी वचन सत्य सच होई।।

(संग्राम पुराण, स्कन्द १२ कांड ६:पधानुवाद, गोस्वामी तुलसीदास)

(সংগ্রাম পুরাণ, স্কন্দ-১২,কান্ড-৬ পদ্যানুবাদ, গোস্বামী তুলসিদাস)

● পণ্ডিত ধর্মবীর উপাধ্যায়-এর অনুবাদ এই রকম:—

''(তুলসীদাস যা বলেছেন:) কোন ধরনের পক্ষপাতিত্ব না করে আমি এখানে সন্ত, বেদ ও পুরাণগুলির মত বর্ণনা করছি। বিক্রমশালী সপ্তম শতাব্দীতে চারটি উজ্জ্বল সূর্য সহ তাঁর জন্ম হবে। রাজত্ব করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ভালোবাসা কিংবা শক্তি দ্বারা তাঁর মতকে সকলকে বোঝাতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে চারজন দেবতা (প্রমুখ সহযোগী) থাকবে। যাদের সহযোগিতায় তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা অনেক হয়ে যাবে। যতদিন সুন্দর বানী (কুরআন) পৃথিবীতে থাকবে মহামদ (হযরত মুহাম্মদ সা.) ছাড়া মুক্তি (নাজাত) পাওয়া যাবে না। মানুষ, ভিখারী, কীটপতঙ্গ এবংপশু এই ব্রতধারীর নাম নেওয়াতেই ঈশ্বরের ভক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁর মত আর কেউ জন্মগ্রহণ করবে না (অর্থাৎ, কোনও রসূল আসবে না)। তুলসী দাসের বচন সত্য ও সিদ্ধ হবে।''

● রেখাবন্ধনীতে প্রদত্ত শব্দগুলি ব্যাখ্যার জন্য লেখা হয়েছে।

এখানে আরও বিষয় স্পষ্ট করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় যে, সংগ্রাম পুরাণ যতই অখ্যাত পুরাণগুলির মধ্যে হোক না কেন, এগুলির উৎস প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। যেমনটা অন্যান্য পূরাণ, গ্রন্থ এবংমতের ভিত্তিতে অর্থাৎ পুরাকালীন প্রমাণাদির আলোকে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের সূচনা দেওয়া হয়েছে। সুরতাংপুরাণ অখ্যাত কি বিখ্যাত, নবীন কি প্রাচীন এতে তথ্য নিরূপণের পথে কোনও বাধা হয় না।

● 'অন্তিম ঈশদূত'— এই গ্রন্ধ ১৯২৭ সালে ন্যাশনালা প্রিন্টিংপ্রেস, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লি থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

উপরে উল্লেখিত সমস্ত কথা আমি হযরত মুহাম্মদ সা. আত্তর ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখক, ড. এম এ শ্রীবাস্তব।

সন্ত তুকারাম: (১৫৭৭-১৬৫০)

মহারাষ্ট্রের একজন মহান সন্ত। তিনি দেহুতে (পুনের নিকটবর্তী) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্র মানুষদের উপর অত্যাচার করার কঠোর বিরোধী ছিলেন। তার লেখা অভংগ খুবই প্রসিদ্ধ। তার মধ্য থেকে একটি এখানে লিখছি--

অল্লা দেবে অল্লা দিলাবে
অল্লা দারু (দাতা)।
অল্লা খিলাবে।
অল্লা বিগর নহীং কোয়।
অল্লা করে সোহি হোয়।।

ভাবার্থ: ঈশ্বর দান করে, ঈশ্বর দান করায়। ঈশ্বর খাওয়ায়। ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া কিছুই হতে পারে না। ঈশ্বর যা চায় তাই হয়।

অব্বল নাম অল্লা বডা
লেতে ভুল জায়ে।
ইলাম ত্যকালজমুপরতাহী তুংব
বজায়ে।।১।।

ভাবার্থ: সকলের আগে ঈশ্বরের নাম, যিনি মহান। তাঁর নাম নিতে ভুলো না। তুর্য বাজিয়ে তাকে উপাসনা কর।

অল্লা এক তুং
নবী এক তুং।
কাটতেং সির পাবোং
নহীং জীব ডরায়ে।।২।।

ভাবার্থ: ঈশ্বর একজনই। তার নবী (শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.) ও একজনই। ঈশ্বর ও নবীকে জানার পর সত্যের পথে চলার সময় মাথা পা কাটারও ভয় থাকে না।

প্যার খুদাই প্যার খুদাই প্যার খুদাই।
প্যার দাই বাবা জিকির খুদাই।।২।।

ভাবার্থ: (এই জগৎ সংসার ঈশ্বরের কুদরত (ক্ষমতা)। এইজন্য মানুষকে ভালোবাসা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে হয়। (ঈশ্বর মানুষকে তার উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন), এজন্য ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা অথবা জপকরা এও ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে হয়।

অল্লা করে সো হোয়
দাবা করতারকা সিরতাতজ।
জিকর করো অল্লাকী
বাবা সবল্যাং অংদর ভেস।
কহে তুকা জো নর
বুঝে সো হি ভয়া দরবেস।।৩।।

ভাবার্থ: যদি ঈশ্বর চায় তাহলে কোনও ব্যক্তির সম্মান মাথায় পরার মুকুটের মতো। এজন্য (এ কথা বুঝে নাও এবং) গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা কর। আর যে এই সত্যকে জেনে নেয়, সেই জ্ঞানী (দরবেশ বা সন্তা) হয়।

বাট খানা
অল্লাহ কহনা একবারা তো হী।
অপনা নফা দেখ
রহে তুকা সো হী সখা
হাক অল্লা এক।।৬।।

ভাবার্থ: ঈশ্বর যা দিয়েছে তা থেকে দরিদ্রদের দান কর এবংসারা দিনে কমপক্ষে একবার তো ঈশ্বরকে স্মরণ কর।

তুকারাম মহারাজযিনি আপনার বন্ধু, তিনি বলেন, ঈশ্বর এক, একথা বলাতেই লাভ (দুই জগতের সফলতা)।

সূত্র: সার্থ শ্রী তুকারামজী গাথা
সম্পাদক: বিষ্ণুবুভা। যোগ মহারাজপান নং৮৯২-৮৯৪।

মহামতি প্রাণনাথের শিক্ষা

হিন্দুদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাণনাথী সম্প্রাদায় উল্লেখযোগ্য। এর প্রতিষ্ঠাতা এবংপ্রবর্তক মহামতি প্রাণনাথ। তাঁর জন্মনাম ছিল মেহরাম ঠাকুর। মহামতি প্রাণনাথ ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাটের জামনগর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানুষকে একেশ্বরবাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবংএক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি নব্যুয়তের অর্থাৎ ঐশীদূত আগমনের ধারণাকে সমর্থন করেছেন এবংতা সত্য বলেছেন। প্রাণনাথজী বলেন:

कै बड़े कहे पैगंबर,

पर एक महामद पर खतम।

অর্থাৎ, ধর্মগ্রন্থগুলিতে অনেক পয়গম্বরকে বড় বলা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের উপর ঐশী দূত আগমনের ধারার শৃঙ্খলা সমাপ্ত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সা. শেষ পয়গম্বর।
মহামতি প্রাণনাথ এক জায়গায় বলেছেন:

रसूल आवेगा तुम पर,

ले मेरा फुरमान।

आए मेरे अरस की,

देखी सब पेहेचान॥

অর্থাৎ, (ঈশ্বর বলেন,) আমার রসূল (দূত) হযরত মুহাম্মদ সা. আমার সুসংবাদ নিয়ে তোমাদের কাছে আসবে। যে আমার আরশকে (রাজাসনকে) খুব ভালো করে চিনবে। অর্থাৎ যে আমার নির্দেশাবলী এবংধর্মকে উত্তমরূপে জানবে। (মারফত সাগর, পৃ. ১৯, শ্রী প্রাণনাথ মিশন, নতুন দিল্লী)

(হযরত মুহাম্মদ আওর ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ, ড. এম এ শ্রীবাস্তব)।

অল্লোপনিষদের শ্লোক

आदल्ला बुक मेककम
अल्लबुक निखादकम॥४॥

এই শ্লোকের অনুবাদ করা যায়নি।

अल्ला यज्ञन हुत हुत्वा अल्ला सुर्य चंद्र सर्व नक्षत्र।। ५॥

অর্থ: যুগ যুগ ধরে আল্লাহর উপাসনা হচ্ছে। সূর্য, চন্দ্র এবংনক্ষত্র সবই আল্লাহর সৃষ্টি।

अल्लों ऋषीणां सर्व दिव्यां इन्द्रायपूर्व माया
परमन्तरिक्षा॥६॥

অর্থ: আল্লাহ্ সন্তদের রক্ষক, তিনি সবার থেকে মহান। আল্লাহ্ সমস্ত বস্তুরাজির পূর্বে এবংসমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের থেকে অধিক রহস্যময়।

अल्ल पृथिव्या अन्तक्षिं विश्वरूपम् ॥७॥

অর্থ: আল্লাহর (তার শক্তির) নিদর্শন পৃথিবী, আকাশ এবংসৌরমণ্ডলের সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রকাশমান।

इल्लांकबर इल्लांकबर इल्लां इल्लल्लेति इल्लल्ला॥८॥

অর্থ: আল্লাহ্ সবার বড়, আল্লাহ্ সব থেকে বড়, তার মতো কেউ নেই।

ओम अल्ला इल्लल्ला अनदि।

অর্থ: (ওম) অর্থাৎ আল্লাহ্। আমরা তাঁর

শুরু এবংশেষ খুঁজেপাই না। সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষার জন্য আমরা তাঁর প্রার্থনা করি।

दे स्वरूपाय अथर्वण श्यामा हुही जनान पशुन सिद्धान।
जलवरान् अदृश्टं कुरु कुरु फट।

অর্থ: হে আল্লাহ! মন্দ, পাপী এবংমানুষদের পথভ্রষ্টকারী লোকদের ধবংস কর এবংপানিকে ক্ষতিগ্রস্তকারী কীটানু (ব্যাকটেরিয়া এবংভাইরাস) থেকে আমাদের রক্ষ কর।

असुरसंहारिणी हुं ही अल्लो रसुल महमदरकबस्य अल्लो।

অর্থ: আল্লাহ্ দানবশক্তির নাশকারী। মুহাম্মদ সা. আল্লাহর পয়গম্বর।

अल्लाम इल्लल्लेति इल्लल्ला।

অর্থ: আল্লাহ্ তো আল্লাহই। তাঁর মতো কেউ নয়। (অল্লোপনিষদ: ৪-১০)

সন্ত তুকডোজী মহারাজ(১৯০৯-১৯৬৮)

সন্ত তুকডোজী মহারাজমহারাষ্ট্রের যাবলীতে জন্মগ্রহণ করেন। পারখেড় গ্রামের শ্রীমান আড়কোজী মহারাজের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি একজন মহান আধ্যাত্মিক সন্ত ছিলেন। তিনি মারাঠি এবংহিন্দী ভাষায় ৩ হাজারের অধিক ভজন (অধ্যাত্মিক কবিতা) লিখেছিলেন। তাঁর ধার্মিক অবদানের জন্য ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ (তৎকালীন রাষ্ট্রপতি) তাঁকে রাষ্ট্রসন্ত উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

সন্ত তুকডোজী মহারাজের মারাঠী ভাষায় লেখা একটি কবিতা (ভজন) এইরূপ:

मुहम्मदाने केली प्रार्थना
विखुरला इसलाम कराया शाहाणा।।

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ সা. পরিশ্রম করেছেন, সেজন্য ইসলাম বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে এবংমানুষ জাগ্রত (জ্ঞানী) হয়েছে।

संघटित केले त्याने स्वजना
तया काळी।।९०।।
लोक प्रतिमापूजक नसावे
त्यांनी एका ईश्वरासि प्रार्थवि।।

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ সা. ওই সময় সমস্ত মানুষকে এই শিক্ষার উপর একত্রিত করেছিলেন যে, মূর্ত্তিপূজা করো না এবংকেবল একমাত্র এক ঈশ্বরের উপাসনা কর।

हा मुहम्मदांचा उपदेश।
नव्हे एकाच देशासाठी।।९।।

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ সা.-এর এই উপদেশ কেবল আরবের জন্য নয় বরংগোটা বিশ্বের জন্য।

(রাষ্ট্রসন্ত তুকডোজী মহারাজবিরচিত গ্রামগীতা : অধ্যায়-২৭, শ্লোক-৯০, পৃ. ২৯৪, অধ্যায়-২৮, শ্লোক-৯, পৃ. ২৯৭)

বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উল্লেখ

হযরত মুহাম্মদ সা. কেবল আরবে ধর্মপ্রচার করার কিংবা কেবল মুসলমানদের মুক্তির পথ দেখানোর জন্য আসেন নি, বরংঈশ্বর তাঁকে গোটা দুনিয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। আর এ কথা হযরত ঈসা আ. বার্নাবাস বাইবেলে বলেছেন।

বার্নাবাস বাইবেল কি?

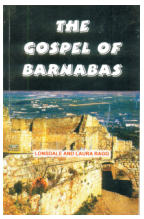

বাইবেল কয়েক প্রকারের। প্রথম বাইবেলকে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলা হয়। ঈশ্বর হযরত মুসা (আ.)-এর উপর এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন। এই গ্রন্থ হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এজন্য এতে হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে কিছু নেই। এরপর মার্ক, ম্যাথ্যু, লিউক এবংইউহানা এই চারজন ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার ৭০ বৎসর কিংবা তারও বেশি সময় পরে হযরত ঈসা (আ.)-এর যে জীবনকথা লিখেছেন এটাকে 'বাইবেলে' বলা হয়। এবংতাঁর লেখা বাইবেল ওই চার ব্যক্তির নামে। তারপর ওই চার বাইবেলকে একটি গ্রন্থে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে এবংনামকরণ করা হয়েছে নিউ টেস্টামেন্ট। এই চার গ্রন্থে (বাইবেলে) হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলা হয়েছে। (এ কথা বলার জন্য ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন)। ষষ্ঠ বাইবেল লিখেছিলেন হযরত ঈসা (আ.)-এর এক সাথী (Apostle) বার্নাবাস। এই বাইবেলে তিনি ঈশ্বর এক এবংহযরত ঈসা (আ.)-কে পয়গম্বর বলেছেন। আর এটা খ্রিষ্টধর্মের প্রচলিত শিক্ষাবিরুদ্ধ। এজন্য পোপ Athanasins ৩৬৭ খ্রিষ্টাব্দে, পোপ Damasius ৩৮২ খ্রিষ্টাব্দে এবংপোপ Gelasius ৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্মের ৭৫ বৎসর পূর্বে এটাকে Apocryphal অর্থাৎ ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। ধর্মবিরুদ্ধ গ্রন্থকে ঘরে রাখা পাপ মনে করা হত এবংএজন্য শাস্তি দেওয়া হতো। এজন্য এই বাইবেল ১৭০০ বৎসর যাবৎ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে ছিল। ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে এর একটা কপি ইতালিয়ান ভাষায় এমাস্টারাডেম (আমস্টারডাম)-এর এক লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে আরও একশো কপি স্প্যানিশ ভাষায় মিডলির ড. মাহেলমামেনের কাছে পাওয়া যায়। এরপর থেকে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার, ভাষান্তর এবংমূদ্রণ হয়েছে। এই বাইবেলে কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবংহযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। এই বাইবেলের কিছু অধ্যায় নিম্নলিখিত।

বার্নাবাস বাইবেলের অধ্যায় নং১২

হযরত ঈসা (আ.) বলেন– আমি ঈশ্বরের পবিত্র নামের প্রশংসা করছি যিনি সমস্ত প্রাণীকুল সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত মহাপুরুষ ও পয়গম্বরদের শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ সা.-কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরণা করা হয়েছে। (অধ্যায় ১২, বার্নাবাসের বাইবেল)

বার্নাবাস বাইবেলের অধ্যায় নং৩৯

যখন ঈশ্বর মানুষ (হযরত আদম)-এর দেহে আত্মা প্রবেশ করান তখন ফেরেশতারা (খুশিতে) বলল– 'হে আমাদের ঈশ্বর। তোমার পবিত্র নাম মহান।'

যখন আদম খাড়া হয়ে দাঁড়ালো তখন তিনি মহাশূন্যে সূর্যের মতো উজ্জ্বলিত একটি লেখা দেখলেন সেখানে লেখা ছিল 'ঈশ্বর এক এবংহযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পয়গম্বর।'

আদম ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'হে আমার মালিক। আমার প্রভু! আমাকে এই লেখার অর্থ বলে দিন। আমার পূর্বেও আপনি কোনও মানুষ সৃষ্টি করেছেন?' তখন ঈশ্বর বললেন– 'হে আমার বান্দা আদম! আমি বলছি তোমাকে, তুমিই হলে আমার সৃষ্ট প্রথম মানুষ। এবংযার নাম তুমি লেখা দেখেছ সে হ'ল তোমার সন্তান এবংবহু বছর পরে পৃথিবীতে আসবে। সে আমার পয়গম্বর হবে। তার জন্যই আমি এই সৃষ্টি নির্মাণ করেছি। যখন সে পৃথিবীতে আসবে পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবে। তার আত্মাকে আমি এই সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার ৬০ হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করেছিলাম এবংনিজের ঐশী ভাণ্ডারে সংরক্ষিত রেখেছি। (অধ্যায় ৩৯, বার্নাবাসের বাইবেল)।

বার্নাবাস বাইবেলের অধ্যায় নং৪৪

হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন– আমি তোমাকে বলছি যে, এই রসূল (হযরত মুহাম্মদ স.) ঈশ্বরের এক গৌরব। ঈশ্বর যাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের সকলের মুক্তি প্রদান করবেন। কেননা ঈশ্বর তাঁকে বুদ্ধি, শক্তি, ন্যায়, সৌজন্যতা, সাহস ইত্যাদি দান করেছেন অন্যান্য প্রাণীদের থেকে তিনগুণ বেশি।

কতই না শুভ হবে সেইদিন যেদিন পৃথিবীতে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তাঁকে দেখেছি এবংতাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছি। যেভাবে সমস্ত পয়গম্বর করে থাকেন। কেন না, তাঁর আত্মা থেকে ঈশ্বর অন্যান্যদের পয়গম্বরী দান করেছেন। যখন আমি তাঁকে দেখলাম তখন আমার আত্মা সুস্পষ্ট হয়ে গেল এই বলে– 'হে মুহাম্মদ! ঈশ্বর আপনার সঙ্গে রয়েছেন, ঈশ্বর আমাকে এই যোগ্যতা দান করুন যেন আমি আপনার জুতার ফিতে বাঁধতে পারি। কেননা, এই করে আমি একজন বড় পয়গম্বর এবংঈশ্বরের প্রিয় হয়ে যাব।'

এই বলে হযরত ঈসা (আ.) ঈশ্বরের অনুগ্রহকে স্বীকার করল (অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল)। (অধ্যায়-৪৪, বার্নাবাসের বাইবেল।)

বার্নাবাস বাইবেলের অধ্যায় নং৯৭বি

তখন পুরোহিতগণ জিজ্ঞাসা করল: 'হে মসীহা! কোন নাম থেকে জানা যাবে এবংতাঁর আগমনের নিদর্শন কি হবে?' হযরত ঈসা (আ.) বললেন, 'সেই মসীহার নাম হবে– 'প্রশংসার যোগ্য'। (এই নামের সংস্কৃত অনুবাদ 'নরাশংস' এবংআরবীতে 'মুহাম্মাদ')। কেননা স্বয়ংঈশ্বর তাঁর এই নাম ওই সময় রেখেছিলেন যখন ঈশ্বর তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন এবংঐশী সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত রেখেছিলেন।

(তাঁকে সৃষ্টি করার পর) ঈশ্বর বললেন– 'মুহাম্মদ প্রতীক্ষা কর, কেননা আমি তোমার জন্য স্বর্গ, পৃথিবী এবংঅধিক সংখ্যায় প্রাণী সৃষ্টি করতে চাই। যাদেরকে আমি উপহার স্বরূপ তোমাকে দান করব। এদের মধ্যে যারা তোমার প্রতি শুভ আচরণ করবে তারা কল্যানপ্রাপ্ত হবে। আর যারা তোমার প্রতি মন্দ আচরণ করবে তারা নিজেরাই মন্দের প্রকোপে পড়বে। যখন আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করব তখন সকলের মুক্তিদাতা পয়গম্বররূপে সৃষ্টি করে প্রেরণ

করব। তোমার বাণী ও শিক্ষা এতই সত্য সঠিক হবে যে, পৃথিবী আকাশ নড়ে যাবে কিন্তু তোমার শিক্ষা (ধর্ম) নড়বে না। এ রকমের পবিত্র অস্তিত্বের নাম মুহাম্মদ।

তখন ঈসা (আ.)-এর সভার সমস্ত সদস্য উচ্চস্বরে বলল– 'হে ঈশ্বর, আমাদের মধ্যে পয়গম্বর প্রেরণ কর। হে মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতির উদ্ধারের জন্য শীঘ্র আসুন।' (অধ্যায় ৯৭বি, বার্নবাসের বাইবেল)।

সংক্ষিপ্তসার

মহাঋষি শ্রী বেদব্যাস, যিনি মহাভারত এবংসতেরো পুরাণের লেখক, এবংজেসাস ক্রাইস্ট (আ.), যাঁর অনুসারীরা সংখ্যায় বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক, এই দুইজন এবংবড় বড় পয়গম্বরগণ ও ধর্মগুরুগণ হযরত মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারী হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ইচ্ছাপূরণ হয়নি, কারণ তাঁরা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁর পরে জন্মগ্রহণ করেছি ও তাঁর অনুসারী হওয়ার সুযোগ আমার পেয়েছি।

যদি আমরা তাঁকে চিনতে না পারি এবংতাঁর আদেশকে মানতে অস্বীকার করি তাহলে সেটা আমাদের জন্য কত বড় দুর্ভাগ্য!

হযরত মুহাম্মাদ সা. এবংইসলাম সম্পর্কে যে মানুষরা তাঁদের পবিত্র অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যদি আমরা সে সবের তালিকা প্রস্তুত করি তাহলে সেসব এই পুস্তকের থেকেও দীর্ঘ হয়ে যাবে। এজন্য আমরা এই অধ্যায়কে এখানেই শেষ করছি। আপনি ৩০ জনেরও অধিক অমুসলিম মহাপুরুষের ইসলামের প্রতি সত্য ও পবিত্র অভিমত নিম্নলিখিত পুস্তকের মধ্যে পড়ে দেখতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট www.freeeducation.co.in-এর মাধ্যমেও এই পুস্তক পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে।

১। সন্ত, মহাত্মা, বিচারবন্ত আওর ইসলাম, সন্দেশ প্রকাশন, পুণে-৪১১০০৫

২। পয়গম্বরে ইসলাম গায়ের মুসলিমোঁ কী নযর মেঁ। ফরীদ বুক ডিপো, নিউ দিল্লী।

অথর্ববেদের ঈশ্বর বন্দনার শ্লোকের মাধ্যমে আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করছি।

ইন্দু ক্রতুং আ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा।
शिक्षा णो अस्मिन् पुरहूत यामनि जीवा ज्योतिर
शीमहि।

(अथर्ववेद-१८:३:६७)

অর্থাৎ পরমেশ্বর এই (সত্যের) পথে আমাদের শিক্ষা (জ্ঞান) দান কর। যেন আমরা আমাদের জীবদ্দশায় সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারি। (অথর্ব বেদ-১৮:৩:৫৭)

৪. হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর আচরণ কেমন ছিল

● জনৈক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আচরণ কেমন ছিল? তার জবাবে তিনি বলেছিলেন– আল্লাহর রসূলের আচরণ ছিল কুরআন।' (হাদীস: মুসলিম)

অর্থাৎ কুরআনে যেমন আচার-আচরণ ও ব্যবহারের আদেশ ঈশ্বর দিয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির অনুশীলনের জন্য, হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর আচরণ ঠিক তেমনটাই ছিল।

● ঈশ্বর এই শব্দাবলীতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর আচরণ সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন–

'হে মুহাম্মদ। তোমার আচরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।' (পবিত্র কুরআন ৬৮:৪)

● হযরত ইমাম মালিক তাঁর গ্রন্থ মুয়াত্তাতে লিখেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'মানবজাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ আচরণ শেখানোর জন্য ঈশ্বর আমাকে পয়গম্বর করেছেন।' (মুয়াত্তা)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) খুবই নম্র স্বভাবের ছিলেন

● হযরত আনাস (রা.) বলেন, 'আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে দশ বৎসর সেবা করেছি, কিন্তু আমি কখনো তাঁকে আমার উপর অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি এবংআমার প্রতি কোনও রূঢ় বাক্য ব্যবহার করেননি। যদি আমার কোনও ভুল হ'ত তাহলে তিনি কখনো আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন না যে, এই ভুল কেন করেছ। আর যে কাজআমার করার কথা ছিল যদি তা না করে থাকি তাহলে কখনো জিজ্ঞাসা করেননি যে, তুমি এ কাজকেন করনি। (বুখারী, মুসলিম, যাদেরাহ-৩১৪)

● হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনো কাউকে নিজের হাত দিয়ে মারেননি– না কোনও স্ত্রীকে, আর না কোনও চাকরকে, আর না অন্য কাউকে। তবে ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুদের অবশ্যই আঘাত করেছেন। তাঁকে কষ্ট দিয়েছে এমন কারও প্রতি কখনো বদলা নেননি।' (মুসলিম, যাদেরাহ-৩৪৬)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভাষা ছিল সুমধুর

● হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমরু বিন আস (রা.) বলেন– 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) বদ মেজাজী ছিলেন না, এবংতাঁর মুখ দিয়ে কখনো অশ্লীল কথা বের হত না।' (বুখারী, মুসলিম, যাদেরাহ-৭৪)।

● অধিকাংশ সময় তিনি নীরব থাকতেন। (সারাহ আল সানা)

● যখনই তিনি কথা বলতেন, তখন এমনভাবে থেমে থেমে কথা বলতেন যে, যদি কেউ এক একটা করে শব্দ গুণতে চায়

কিংবা লিখতে চায় তাহলে সে লিখতে পারত। (বুখারী, মুসলিম, মারেফুল হাদীস, খণ্ড-৮, পৃ. ২৩৮)

● তিনি যে বাক্য ব্যবহার করতেন, সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এতটা উৎকৃষ্ট ছিল যে, আজও মানুষ তার অনুশীলন করতে থাকে। এই ব্যক্যগুলির সংকলনের নাম 'জামিউল কালাম'।

হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রখর আত্মসংযমী ছিলেন

একবার এক গ্রাম্য মানুষ মদীনায় আসলো এবংহযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চাদর ধরে (যেটা পয়গম্বর সা. গায়ে জড়িয়ে ছিলেন) এমন জোরে টান মারল যে, তাঁর ঘাড়ে রগড়ানির দাগ পড়ে গেল। আর সে লোকটা বলল, 'হে মুহাম্মদ (সা.)! ঈশ্বর তোমাকে যা দিয়েছেন তা থেকে আমাকেও কিছু দাও।' তার এই দুর্ব্যবহারের জন্য যে কেউ তাকে দুটো থাপ্পড় মেরে দিত। কিন্তু রসূল (সা.) সংযম অবলম্বন করলেন। তিনি কেবল একটু মুচকি হেসে দিলেন এবংসাথীদের বললেন, তাকে কিছু আনাজপাতি দিয়ে দিতে। (বুখারী, মা'রেফুল হাদীস, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩২)

একবার জনৈক গরীব মুসলমানকে সাহায্য করার জন্য এক ইহুদীর নিকট থেকে কিছু অর্থ ধার করেছিলেন। যখন ওই ইহুদী নিজের পয়সা আদায়ের জন্য আসলো তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। কিন্তু ইহুদী জিদ ধরল, সে তার টাকা না নিয়ে যাবে না। ফলে সে মসজিদেই বসে রইল। ওই ইহুদী দুপুরের পূর্বে এসেছিল আর তারপরের দিন সকাল পর্যন্ত বসে রইল। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঋণ করেছিলেন তাই তিনিও ইহুদীর সঙ্গে একটানা মসজিদে বসে রইলেন। তাঁর সাথীরা ঋণ পরিশোধ করে দিতে চাচ্ছিল কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। তাঁর সাথীরা ইহুদীকে ওখান থেকে চলে যেতে বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি কাউকে ইহুদীর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে দিলেন না। ওই ইহুদী তাদের ধর্মগ্রন্থে পড়েছিল যে, অন্তিম পয়গম্বরের মধ্যে খুব বেশি সংযম এবংধৈর্য্য থাকবে। যখন সে নিজের চোখে দেখল তখন বলল, 'আপনি সত্য পয়গম্বর। আমার সমস্ত সম্পদ আপনার পদতলে সমর্পিত। আপনি যেভাবে পারবেন, তা খরচ করবেন।' (মিশকাত, মা'রেফুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯)

হযরত মুহাম্মদ সা. ওয়াদা পালনে নিতান্তই নিষ্ঠাবান ছিলেন

একবার এক ব্যবসায়িক লেনদেন প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও এক ইহুদী (আবদুল্লাহ বিন আবিল হামা) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁরা কোনও এক জায়গায় একত্রিত হবেন। নির্ধারিত সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওই জায়গায় পৌঁছে গেলেন, কিন্তু ওই ইহুদী সাক্ষাৎ করার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রমাগতভাবে তিনদিন ওই স্থানে যেতে থাকলেন। তৃতীয় দিনে ইহুদী ব্যক্তির মনে পড়ল সাক্ষাৎকারের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি এবংছুটতে ছুটতে সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়ে দেখল– হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওই স্থানে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। সে তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য শুধু এতটুকুই বললেন–

'তুমি আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছ, কেননা বিগত তিনদিন যাবৎ তোমার অপেক্ষা করছি।' (শিফা, পৃ. ৫৬)

অমুসলিমদের প্রতি তাঁর ব্যবহার

একবার হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রা.)-এর মা, যিনি অমুসলিম ছিলেন এবংমক্কাতে থাকতেন, মদীনায় আসলেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। হযরত আসমা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন– 'আমার মা মুসলিম নয়, আমি তাঁর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করব?' পয়গম্বর (সা.) জবাবে বললেন, 'একজন মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিৎ সেরকম উত্তম ব্যবহার করবে। তবে যদি ইসলাম বিরুদ্ধ কোনও কথা বলে তাহলে সে কথা মানবে না।' (বুখারী, মুসলিম, মুনতাখাবে আবওয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮১)।

হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন, যদি কোনও সত্যপন্থী মুসলমান কোনও অমুসলমানের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আমি ওই মুসলমানের বিরুদ্ধে এবংঅমুসলমানের পক্ষে মকদ্দমা লড়ব। (আবু দাউদ, সফিনায়ে নাজাত-১৫১)

হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন, যদি অন্য সম্প্রদায়ের কোনও সম্মানীয় ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসে তাহলে তাকে সম্মান করো। (জামিউল কালাম)

হযরত আয়েশা রা. বলেন– একবার একজন ইহুদী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলো। তিনি ইহুদী ব্যক্তিটির সঙ্গে খুবই সম্মানজনকভাবে কথাবার্তা বললেন। যখন সে চলে গেল, তখন তিনি হযরত আয়েশা রা.-কে বললেন, 'এই ব্যক্তিটি সজ্জন ব্যক্তি নয়।' হযরত আয়েশা রা. অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে আপনি তার সঙ্গে এতটা সম্মান প্রদর্শন করে কথাবার্তা বললেন কেন?' তখন নবী সা. বললেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে খারাব ব্যক্তি সে, যার দুর্ব্যবহারে মানুষ তার থেকে দূরে সরে যায়। আর আমি এমন মানুষ হতে চাই না। (তিরমিযি, বাইহাকী)

হযরত মুহাম্মদ সা. কট্টরপন্থী ছিলেন না (অর্থাৎ বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না)

হযরত আয়েশা রা. বলেন, হযরত মুহাম্মদ সা. নিজের সাথীদের জন্য সহজতা চাইতেন। এজন্য যখন দু'টি কাজের মধ্যে একটাকে নির্বাচন করতে হত, তখন যদি গুনাহ না হয় তাহলে সহজকাজকে নির্বাচন করতেন।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, হযরত মুহাম্মদ সা. আমার ঘরে আসলেন, সে সময় একজন মহিলা আমার ঘরে ছিলেন। নবী সা. জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই মহিলা কে?' আমি বললাম, 'ইনি সেই মহিলা যাঁর নামায প্রসিদ্ধ।' (অর্থাৎ তিনি সাধারণ মানুষদের তুলনায় বেশি নামায পড়তেন)। হযরত মুহাম্মদ সা. বললেন, এমনটা করো না। তুমি ততটাই করবে যতটা তুমি পারবে। পুণ্য দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ অনীহা (ক্লান্তি) প্রকাশ করেন না, কিন্তু তুমি নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহতায়ালার ওটাই পছন্দ যা তুমি সময় করতে পারবে।' (বুখারী, মুসলিম) (অর্থাৎ নবী সা.

সহজএবংমধ্যম পন্থা অধিক পছন্দ করতেন।)

নির্ধারিত সময়ে সারা দিনে রাতে ৫ বার নামায পড়া বাধ্যতামূলক।

এক মহিলা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কাছে অভিযোগ করল—'আমার স্বামী সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল ভোরবেলার নামায (ফজরের নামায) যা সূর্যোদরে পূর্বে পড়া উচিত, তিনি নামায সূর্যোদয়ের পরে পড়েন। তার স্বামীও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। ফলে হযরত মুহাম্মদ সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন— একথা কি সত্য?'

সেই সাহাবা জবাব দিলেন, হ্যাঁ, এ কথা সত্য। আর এর কারণ হ'ল এই যে, আমি একজন কৃষক। আমার ক্ষেত কুয়া থেকে বেশ দূরে। সেচের পানি প্রথমে নিকটবর্তী ক্ষেতগুলোতে পৌঁছে যায়। মধ্যরাতে আমার ক্ষেত পর্যন্ত পানি আসতে সময় লাগে। সেচের কাজসম্পন্ন হওয়ার পর মধ্যরাতে যখনি আমি শয়ন করি তখন ক্লান্তিজনিত কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে আমার ঘুম ভাঙেনা, আর আমার ফজরের নামায ছেড়ে যায়।' এই সাহাবার বর্ণনা শোনার পর নবী সা. শুধু এতটুকুই বলেন— 'ঠিক আছে, সকালে যখনই ঘুম ভাঙবে তৎক্ষণাৎ নামায পড়ে নেবে।'

হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন— 'ধর্মকে নিজের পক্ষ থেকে কঠিন করে নেওয়া ব্যক্তি ধবংস হয়ে গেছে।' (মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন)

হযরত মুহাম্মদ সা. এবংতাঁর পরিবার অত্যন্ত দানশীল ছিলেন

● হযরত সুহাইল বলেন— আমি দেখলাম, জনৈক সাহাবা সেই চাদরখানা চাইল যেটা হযরত মুহাম্মদ সা. গায়ে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর ওই চাদরের প্রয়োজনীয়তা ছিল, তথাপিও তিনি সেই সাহাবাকে নিজের চাদর খুলে দিয়ে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর চলে যাওয়ার পর লোকেরা ওই সাহাবাকে তিরস্কার করল এবংবলল— তুমি দেখছ যে, মুহম্মাদ সা.-এর ওই চাদরের প্রয়োজন রয়েছে, তা সত্ত্বেও তুমি ওই চাদরটা চাইলে কেন? তখন জবাবে ওই সাহাবা বলল— 'এই পবিত্র চাদরকে আমি আমার কাফনের জন্য চেয়েছি।' (সহীহ বুখারী, মারেফুল হাদীস, খণ্ড-২, পৃ. ১৯৪)

● মদীনা এবংখায়বার এলাকায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কিছু জমি (ক্ষেত) ছিল। সেই জমিতে এত বেশি ফসল উৎপাদন হ'ত যে, তাতেই তাঁর পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হতে পারত। কিন্তু তিনি এবংতাঁর পরিবার এত বেশী দানশীল ছিলেন যে, সমস্ত ফসল আনাজপাতি যাঞ্চাকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবংস্বয়ংনিজেরা খেজুর আর পানিতে জীবনধারণ করতেন।

● তিনি কোনও প্রার্থীকে কখনো না বলেননি, যদি কোনও গরীব মানুষ তাঁর কাছে কিছু চাইত এবংতাঁকে দেওয়ার মতো কিছু কাছে না থাকত তখন তিনি ধার করে নিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করতেন। যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন তাঁর বর্মটি এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল। (বুখারী, মুসলিম, মারেফুল হাদীস, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৩৩)

তিনি খুবই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন

হযরত হযরত মুহাম্মদ সা. নিতান্তই ন্যায়-

পরায়ণ ছিলেন। এজন্য ইহুদি এবংঅমুসলিমরা তাদের নিজেদের বিবাদ মেটানোর জন্য ন্যায় বিচারের আশায় তাঁর কাছে আসতো। বেশ কয়েকবার তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। এ ধরনের একটি ন্যায় বিচারের বর্ণনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। (পবিত্র কুরআন ৪:৬২)

প্রাচীনকালে স্থায়ী সরকার ও কারাগার ছিল না। এজন্য ইসলামের সমস্ত দণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হত। ইসলামে চোরের শাস্তি হাত কেটে দেওয়া। ফাতিমা মাকজুনিয়া একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা ছিল। একবার সে চুরি করল এবংধরা পড়ে গেল। আদালত তার হাত কেটে নেওয়ার রায় প্রদান করল। কিছু মানুষ হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কাছে সুপারিশ করল যে, সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, তাই তাকে মাফ করে দেওয়া হোক। এ কথায় হযরত মুহাম্মদ সা. অসন্তুষ্ট হলেন এবংবললেন– 'যদি আমার কন্যা ফাতিম (রা.)-ও এই কাজকরত তাহলে তাকেও এই শাস্তি দেওয়া হতো।' (মিশকাত শরীফ)

হযরত মুহাম্মদ সা. খুব বাহাদুর (শক্তিশালী ও সাহসী) ছিলেন

রাকানা ছিল মক্কার সবথেকে বড় পালোয়ান। সে হযরত মুহাম্মদ সা.-কে বলল—যদি তুমি আমাকে হারাতে পারো তাহলে আমি মুসলমান হয়ে যাবো। মুহাম্মদ (সা.) তাকে তিনবার পরাজিত করেন। (সীরাতে মুজতবা)।

হযরত বারা বিন আযীব রা. বলেন– 'যুদ্ধের ময়দানে নবী সা. সবার সামনে থাকতেন। তাঁর উপর হামলাও বেশি হ'ত। ফলে যারা খুব সাহসী শক্তিশালী হ'ত তারা তাঁর সঙ্গে থাকত। ঘোরতর যুদ্ধের ময়দানে যখন কোনও আহত মুসলিম সৈনিক নিজেকে রক্ষা করতে চাইত সে তাঁর পিছনে চলে আসত।

● হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুরা যখন শর বর্ষণ করছিল তখন তীরের আঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মুসলিম সৈন্যদের পিছনে সরে যেতে হল। কিন্তু এই গম্ভীর পরিস্থিতিতেও হযরত মুহাম্মদ সা. এবংপাঁচ দশজন সাথী পিছু হটেননি বরংএগিয়েই যাচ্ছিলেন। হযরত আব্বাস রা. ওমরাহকারী ১৪০০ সাহাবাদের আওয়াজদিলেন। যখন তারা প্রত্যাবর্তন করল এবংপুনরায় হামলা করল তখন মুসলমান সৈন্যরা নিজেদের সামলে নিল এবংবিজয়লাভ করল। (সীরাতে মুজতবা)

● একবার মদীনা শহরের এক প্রান্ত থেকে খুব জোরালো আওয়াজশোনা গেল এবংলোকেরা মনে করল যে, কেউ আক্রমণ করেছে। হাতিয়ার সংগ্রহ করে লোকেরা সব বের হওয়ার তোড়জোড় করছে, তখন দেখা গেল হযরত মুহাম্মদ সা. ইতিমধ্যে ঘোড়ার নগ্ন পিঠে সওয়ার হয়ে এবংতলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে সেখান থেকে ফিরে আসছেন। এবংলোকদের উদ্দেশ্যে বললেন–চিন্তার কোনও আবশ্যকতা নেই। (বুখারী)

তিনি খাদ্যসামগ্রীর খুব মর্যাদা দিতেন

● হযরত আবু হুরাইরাহ রা. বলেন যে, যখন তাঁর সামনে খাদ্য রাখা হত তখন যে

খাবার তাঁর পছন্দ হত সেই খাবার খেতেন। আর যদি অপছন্দ হত তাহলে উঠে যেতেন, খেতেন না, কিন্তু কোনও খাবারকে খারাপ বলতেন না। (বুখারী)

● হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার হযরত মুহাম্মদ সা. আমার ঘরে আসলেন। ঘরের মেঝেতে রুটির একটু টুকরা দেখতে পেয়ে তিনি সেটা তুলে নিলেন এবংপরিষ্কার করে খেয়ে নিলেন। তারপর বললেন– আয়েশা! ভালো জিনিসকে সম্মান কর, কেননা (ঈশ্বরের এই দানকে অমর্যাদা করার কারণে) এই দান যে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চলে গেছে তা পুনরায় ফিরে আসেনি। (সুনান ইবনে মাজাহ)।

(অর্থাৎ খাদ্যকে অমর্যাদা করার কারণে যে লোক গরিব হয়ে গেছে সে পুনরায় সম্পদশালী হয়নি।)

তিনি অত্যন্ত হাসিমুখ সম্পন্ন ছিলেন

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'আমি মানবজাতির জন্য সহজতা ও সুবিধা চাই, অসুবিধা ও কষ্ট নয়।' (পবিত্র কুরআন ২:১৮৫)।

● হযরত মুহাম্মদ সা. হাসিখুশি মেজাজের ছিলেন। হযরত আবু হুরাইরাহ রা. বলেন, লোকেরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করত, হে আল্লাহর রাসূল সা.! (আপনি পয়গম্বর হয়েও) আপনি সব সময় হেসে ও হাসিয়ে কথা বলেন। জবাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! কিন্তু আমি কোনও ভুল কথা কিংবা ইসলাম বিরুদ্ধ কোনও কথা বলি না।' (তিরমিযী, যাদে রাহ-৩২০)

● হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিস বলেন– আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর থেকে বেশি কাউকে স্মিতহাস্য মুখে দেখিনি। (তিরমিযী, মুনতাখাবে আবওয়াব-৮২৭)

● হযরত আবু যার বলেন– হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন, 'নিজের ভাইয়ের সম্মুখে (তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাপূর্ণ ভাবে সাক্ষাতের জন্য) হাসিমুখ দেখানো দান করার মতো পূণ্য কর্ম। (তিরমিযী-১৯৫৬, হাদীসে নববী-১১০)

● হযরত মুহাম্মদ সা. এর হাসি সবসময় স্মিত হাসি ছিল। হযরত আয়েশা রা. বলেন, 'আমি তাঁকে কখনো এত জোরে হাসতে দেখিনি যে তাঁর মুখগহ্বর দেখা যায়।' (বুখারী, মুসলিম)

মানুষ তাঁকে সম্মান করুক এটা তিনি নিজের থেকে চাইতেন না

● হযরত মুহাম্মদ সা.-এর একজন সাহাবা (সাথী) ইরাক, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদী দেশে ব্যবসা করতেন। লোকেরা ওখানে গিয়ে দেখত সেখানকার মানুষরা তাদের ধর্মগুরুদের সিজদা করে সম্মান প্রদর্শন করে। কিংবা দাঁড়িয়ে তাদের হাতে চুম্বন করে। যখন সাহাবারা রসূল সা.-কে এ কথা জানালো– 'হে আল্লাহর রসূল সা.! আমরাও এমনভাবে সম্মানজনক আচরণ আপনার সঙ্গে করতে চাই।' তখন তিনি এমনটা করতে নিষেধ করলেন।

● হযরত মুহাম্মদ সা. এটাকে অপছন্দ করতেন যে, কোনও সভাস্থলে কেউ আসলে তার সম্মানে সবাই দাঁড়িয়ে যাবে। (তিরমিযী, মুনতাখাবে আবওয়াব, খণ্ড-১,

পৃ. ৭৭৮)

● তিনি একথাও বলেছেন যে, তাঁর কবরের উপর যেন কোনও স্মারক স্থাপন করা না হয়। কিংবা তাঁর কবরকে সিজদা করা যেন না হয়।

হযরত উমার বলেন– হযরত মুহাম্মদ বলেছেন, 'সীমার অতিরিক্ত প্রশংসা আমাকে করো না, যেমনটা খৃষ্টানরা হযরত ঈসা আ.-কে করে থাকে। (তাঁকে পয়গম্বর থেকে উঠিয়ে নিয়ে ঈশ্বরের পুত্র বানিয়ে দিয়েছে)। আমি আল্লাহর দাস। এজন্য তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা (দাস) ও পয়গম্বর বলবে। (বুখারী, মুসলিম, মুনতাখাবে আবওয়াব, খণ্ড-১, পৃ. ৯৬৫)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমাজের মধ্যে শান্তি ও ভালোবাসা প্রত্যাশা করতেন

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছেন– 'হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের কোনও সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে কোনও উপহাস না করে, এমনও তো হতে পারে, তারা উপহাসকারীদের চাইতে উত্তম। আবার নারীরা যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে, কারণ যাদের উপহাস করা হচ্ছে, হতে পারে তারা উপহাসকারিণীদের চাইতে উত্তম। একজন আর একজনকে দোষারোপ করবে না, আবার একজন আরেকজনকে খারাপ নাম ধরেও ডাকবে না, ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা বড় ধরনের অপরাধ, যারা এ আচরণ থেকে ফিরে আসবে না তারা হবে যালেম। (সূরা হুজুরাত, আয়াত-১১)

● হযরত মুহাম্মাদ সা. তাঁর সাহাবাদের নিষেধ করেছেন যে, তারা যেন তাঁর সম্পর্কে কাউকে ভুল বর্ণনা না দেয়। তিনি বলেছেন—'আমি চাই আমার হৃদয় আমার সাথীদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হোক।' (মুনতাখাবে আরওয়াব)

● কারো দোষ জানার জন্য পিছনে লেগে থাকতে তিনি নিষেধ করেছেন। (সূরা হুজুরাত:১১)

● তিনি বলেছেন, 'একজনের জীবন, সম্পদ এবংসম্মান অন্যজনের জন্য সম্মানীয়। প্রত্যেকে একে অন্যের জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করবে এবংকাউকে অপমান করবে না।' (খুৎবা, হুজ্জাতুল বিদা)।

● হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'হযরত মুহাম্মদ সা. যখন কারও দোষ সম্পর্কে অবগত হতেন, তখন তিনি তাকে ডেকে সকলের সামনে তিরস্কার করতেন না। বরংতিনি মসজিদে কারও নাম না নিয়ে এমনভাবে বক্তব্য পেশ করতেন যাতে সকলে সেই দোষ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এবংসেই ব্যক্তিও নিজেকে শুধরে নিতে পারে।' (শিফা-৫২)

● হযরত হানজালা রা. বলেন– হযরত মুহাম্মদ চাইতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুন্দর এবংতার পছন্দনীয় নামে ডাকা হোক। (আদাবুল মুফরাদ)

● সমাজের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সদ্ভাবনা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে সালাম দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসলিম, মুনতাখাবে আবওয়াব,

২ খণ্ড, পৃ. ৩৯১)

● তিনি প্রথমেই সালাম দিতেন এবংবলতেন, যে প্রথমে সালাম দেয় তার মধ্যে অহংকার থাকে না। (বাইহাকী, মুসলিম, মুনতাখাবে আবওয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩)।

● তিনি মহিলাদের এবংবাচ্চাদেরও সালাম দিতেন। (আহমদ, মুনতাখাবে আবওয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২)

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি আমাদের কর্তব্য

● ঈশ্বরের সঠিক নির্দেশাবলী আমাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য হযরত মুহাম্মদ সা. এবংতাঁর পরিবার তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। আর তার বিনিময়ে তিনি ও তাঁর পরিবার আমাদের কাছে কোনও কিছুর প্রত্যাশা করেননি। আর আমরা না তাঁর জন্য এবংনা তাঁর খানদানের জন্য কিছু দিতে পারব। তাই আমরা যখনই তাঁর নাম শুনবো তখন আমরা ঈশ্বরের কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করবো। 'হে ঈশ্বর! হযরত মুহাম্মদ সা. এবংতাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আপনার কৃপা বর্ষণ করুন।'

● হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্য এইভাবে প্রার্থনা করাকে আরবী ভাষায় 'দরূদ পড়া' বলা হয়।

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে আমাদের সকলকে তাঁর উপর দরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (পবিত্র কুরআন-৩৩:৫৬)

● ফেরেশতাদের সরদার হযরত জিবরাঈল আ. ওই সমস্ত অকৃতজ্ঞ মানুষদের অভিশম্পাত দিয়েছেন যারা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর অবদানকে অস্বীকার করে এবংতাঁর নাম শোনার পর নীরব থাকে ও তাঁর জন্য প্রার্থনা করে না (অর্থাৎ দরূদ পড়ে না।)।

● তাঁর জন্য সব থেকে সহজপ্রার্থনা (দরূদ) হ'ল– 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।' অর্থাৎ, 'হে ঈশ্বর এবংতাঁর পরিবারবর্গের উপর কৃপা বর্ষণ করুন।' এজন্য যখনই আপনি হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর নাম শুনবেন তখনই দরূদ পড়ে নেবেন।

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে মানুষদের নির্দেশ দিয়েছেন– ঈমানদাররা হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সঙ্গে যখনই কথা বলবে তখন সে যেন সম্মানজনকভাবে এবংমধ্যম আওয়াজেকথা বলে অন্যথায় তার সমস্ত সৎকর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। (পবিত্র কুরআন-৪৯:২-৩)। এজন্য আজও সম্মানজনকভাবে তাঁর নাম নেওয়া উচিৎ।

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক

মাইকেল এইচ হার্ট এক বিশ্বখ্যাত পুস্তক রচনা করেছেন, যার নাম 'The 100 ranking of the most influencial persons in history' (লেখক স্বয়ংখ্রিষ্টান কিন্তু তিনি বিশ্বের সবথেকে প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে হযরত ঈসা আ.-এর পরিবর্তে হযরত মুহাম্মদ স.-এর নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। এর কারণ কি? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন– হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কাছে ধন-সম্পদ, শিক্ষা, সৈন্য ইত্যাদী কিছুই ছিল না। কিন্তু কেবলমাত্র ২৩ বৎসরের সংগ্রামে তিনি মানবজাতির জীবনে যে প্রভাব রেখে গেলেন তা আশ্চর্যজনক এবংসবথেকে বেশি।

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কথার প্রভাব ছিল। মানুষ তাঁর আদেশ ও উপদেশ শুনত, আর তৎক্ষণাৎ মেনে নিত এবংপালন করত। কেননা তিনি যা বলতেন, সর্বাগ্রে তিনি নিজেই তা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতেন। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। এজন্য তাঁর শিক্ষার প্রভাব ছিল। এর কিছু উদাহরণ পেশ করা হল।

● তিনি সকলকে পাঁচবার (পাঁচ ওয়াক্ত) নামায আদায় করতে বলেছেন, কিন্তু তিনি নিজেআটবার নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদ, ইশরাক এবংচাশ্‌ত ছিল তাঁর অতিরিক্ত নামায।

● তিনি দান করার সময় সকলকে নিজের পরিবারের জন্য কিছু বাঁচিয়ে রাখতে বলতেন। কিন্তু তিনি নিজের সবকিছু দান করে দিতেন।

তিনি সকলকে রমযানের একমাস উপবাস (রোযা) করতে বলেছেন, কিন্তু তিনি রমযানের সঙ্গে শাবানের রোযা রাখতেন এবংবছরের প্রত্যেক মাসে ন্যূনতম তিনটি রোযা অবশ্যই রাখতেন।

● যখন তিনি মদীনাতে মসজিদ নির্মাণ করছিলেন তখন তিনিও সকলের সঙ্গে মাটি পাথর একত্রিত করে বহন করছিলেন।

● মক্কার এক হাজার সৈনিকের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যখন তিনি বদরে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর সাথীদের সকলের জন্য উটের ব্যবস্থা করা যায়নি তখন এক একটা উটের পিঠে তিনজন পালা করে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন এবংকিছুদূর পর্যন্ত আবার পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ সা.-ও সকলের মতোই পালাক্রমে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন এবংউটের পিঠে সওয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। সাথীদের ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি একাকী সওয়ার হয়ে যাওয়া পছন্দ করেননি। (মিশকাত, যাদে রাহ, পৃ. ২৩৫)

● ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধে যখন পরিখা খনন করা হয়েছিল তখন কম সংখ্যক মুসলমান সৈনিকরা যতটা করে পরিখা খনন করেছিল হযরত মুহাম্মদ সা.-ও ততটা খনন করেছিলেন।

এই যুদ্ধ একমাস যাবৎ চলেছিল এবংখাদ্য পানীয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন সমস্ত সৈনিক যেমনভাবে অভুক্ত ছিল তিনিও তাদের সঙ্গে সেভাবে অভুক্ত ছিলেন অর্থাৎ তিনি মানবজাতির জন্য যে শিক্ষা প্রদান করেছেন, সর্বাগ্রে তিনি তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি মানুষকে সেই পথে চলার জন্য বলেছেন।

হযরত মুহাম্মদ সা. দেখতে কেমন ছিলেন

● তিনি উচ্চতায় খুব লম্বাও ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সাহাবাদের মধ্যে যখন থাকতেন তখন তাঁকে সকলের থেকে উঁচু দেখাত। (তিরমিযি, ১ম খণ্ড)

● তাঁর শরীরের রঙ ছিল গমের রঙের মতো। (তিরমিযি, ১ম খণ্ড)

● হযরত আবু হুরাইরাহ রা. বলেন, 'তাঁর গায়ের রঙ গৌরবর্ণের কাছাকাছি ছিল। (তিনি) একেবারে গৌরবর্ণের ছিলেন না।' (মুসনাদে আহমদ-৯৪৪)

● হযরত আলী (রা.) বলেন, তাঁর গায়ের

রঙ ছিল লাল ও সাদার সুন্দর সংমিশ্রণ। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৯৪৪)।

● তাঁর মাথার চুল একেবারে সোজাও ছিল না, আবার খুব কোঁকড়ানোও ছিল না। বরংহালকা কোঁকড়ানো ছিল। তিনি কানের লতি পর্যন্ত (কাঁধের কিছুটা উপর পর্যন্ত) লম্বা চুল রাখতেন। তিনি চুলে তেল লাগাতেন। (তিরমিযি)

● তাঁর ৬৩ বৎসর আয়ুতে মাত্র ২০টি চুল সাদা হয়েছিল।

● তাঁর চোখ বড় বড় ছিল। চোখের তারা ছিল কালো। সাদা অংশে লাল ধারা ছিল। তিনি চোখে সুর্মা লাগাতেন। (তিরমিযী)

● তাঁর হাত-পা ছিল ভরাট এবংরেশমের মতো নরম। (তিরমিযী)

● তাঁর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না। কিন্তু সামান্য গোলাকার ছিল। (তিরমিযী)

● তাঁর বুক ছিল চওড়া এবংকাঁধ ছিল ভরাট মজবুত। পেট ও বুক সমান ছিল। (অর্থাৎ ভুঁড়ি বের হয়ে থাকত না।)। (তিরমিযী)

● তাঁর চলনে গতি ছিল। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুততার সঙ্গে হাঁটতেন। এমনভাবে হাঁটতেন যেন উঁচু থেকে নীচের দিকে অবতরণ করছেন। অর্থাৎ পদক্ষেপ থেমে থেমে ফেলতেন। (তিরমিযি নং৩৪৬)

ঈশ্বর প্রত্যেক পয়গম্বরকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দান করেন। ঈশ্বর তাঁকে খুব আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ এক নজর দেখলেই প্রভাবতি হয়ে পড়ত। আর যারা তাঁর নিকটে থাকত তারা তাদের জীবনের থেকেও বেশি তাঁকে ভালোবাসত। (মিশকাত, খণ্ড-৫, ৩৭৩)

৩. হযরত মুহাম্মদ সা. এর উপদেশ

● হযরত মুহাম্মদ সা. যা কিছু বলেছিলেন এবংতিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছিলেন সেসব কিছুকে জ্ঞানী ও পণ্ডিত মানুষরা লিখে নিয়েছিলেন। ওইসব বিদ্বান মানুষদের লিখিত গ্রন্থকে হাদীস বলে। যেমন বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ। হযরত মুহাম্মদ সা. এর বর্ণিত বচনকে হাদীস বলা হয়। আমরা এখানে হাদীসের কিছু সারাংশ ও ভাবার্থ পেশ করছি এবংহাদীসের সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির নামও উল্লেখ করা হচ্ছে যেখান থেকে হাদীসগুলি নেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনের জন্য উপদেশ

● নিজের সন্তানদের ভালো নাম রাখ কেননা কিয়ামতের দিন ঈশ্বরের দরবারে সকলের নাম ধরে ডাকা হবে। (মুসনাদে আহদাম, আবু দাউদ)

● প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শিক্ষার্জন করা অত্যাবশ্যক। (ইবনে মাজাহ)

● শিক্ষা অর্জন কর। তার জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও। (দুর্বল হাদীস/ কিমিয়ায়ে সাআদাত) (৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল।)

● সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও। (কেননা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি সমাজের সেবা করতে পারে)। (মুসলিম)

● নিজের পিতামাতাকে এমনভাবে সেবা কর যেন ঈশ্বর তোমাকে মুক্তি দান করেন। যে ব্যক্তি এমনটা করে না সে ইহকালীন জীবনে অপমানিত হবে। (বুখারী)

● যদি তুমি তোমার মাতাপিতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর তাহলে তোমার সন্তানও তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। (মুসতাদরাক-৭২৫৮)

● মাতাপিতার আজ্ঞাপালনের জন্য ঈশ্বর আয়ু বৃদ্ধি করে দেন। (কানজুল আমাল-৪৫৪৬৮)

● যদি মাতাপিতা অসন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে ঈশ্বরও অসন্তুষ্ট হবেন। (শো'বুল ঈমান-৭৮৩০)

● নবী সা. বাচ্চাদের খুব ভালোবাসতেন। তার ছোট কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) যখন সাক্ষাৎ করতে আসতেন তখন তিনি তার কপালে চুমো দিতেন।

● পয়গম্বর সা. বলেন, যে ছোটকে ভালোবাসে না এবংবড়কে সম্মান করে না সে মুসলমান নয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

● যদি সম্ভব হয় (অর্থাৎ সক্ষম হয়) তাহলে যুবকদের উচিত বিয়ে করা। বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবংঅশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। (ইবনে মাজাহ, খণ্ড:২, পৃ: ২০)

● সেই বিবাহ মঙ্গলজনক, যে বিবাহে

খরচ খুব কম হয়। (মুসনাদে আহমাদ ২৪৫২৯)

● জ্ঞাতসারে যে যেমনভাবে জীবনযাপন করবে, তার মৃত্যুও তেমনই হবে। (তিরমিযী)

(অর্থাৎ কেউ পাপ করে যাচ্ছে এবংভাবছে বৃদ্ধাবস্থায় ভালো মানুষ হয়ে যাবে- এমনটা হবে না। সে ব্যক্তি পাপ করেই যাবে। এজন্য পাপকাজছেড়ে দিতে দেরী না করা উচিত।)

● পুরুষরা তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখবে (পরস্ত্রীর প্রতি নজর দেবে না।) (পবিত্র কুরআন, ২৪:৩০)

● আয়েশ-আরামের জীবন থেকে দূরে থাক। কেননা ঈশ্বরের বিশেষ বান্দারা আরাম আয়েশের জীবনযাপন করে না। (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-২, হাদীস নং-১৩১৭)

● যে কোনও মাদক দ্রব্য এবংবুদ্ধিনাশকারী দ্রব্য ব্যবহার কর না। (আবু দাউদ- ৩৬৮৬)

● সর্বদা সত্য কথা বল, তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও। কেননা সত্যতার মধ্যেই রয়েছে সাফল্য। (কানজুল আমাল-৬৯৫৬)।

● ঈশ্বরের নাম নিয়ে একসঙ্গে বসে ভোজন কর এতে তোমাদের বরকত (সমৃদ্ধি) হবে। (আবু দাউদ-৩৭৬৪)

● জিহ্বা হল সবচেয়ে বড় বিপদ। (তিমমিযী-২৪১০)

(মিথ্যাবাদীরা বেশি নরকে যাবে)

● কোনও ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে শোনা কথাকে যাচাই ও পরীক্ষা না করে অন্য মানুষের কাছে বলে বেড়ায়। (মুসলিম-৮)

● যেটা তোমার মনে খটকা লাগবে এবংতোমার ভালো লাগবে না সেটাই পাপ--লোকেরা এটা জেনে রাখুন। (মুসলিম-৬৬৮০)

● যে ব্যক্তি এমন রাস্তায় চলে যার উদ্দেশ্য সত্যের জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া, ঈশ্বর সে ব্যক্তির জন্য স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা সহজকরে দেবেন। (মুসলিম-৬৮৫৩)

● তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর, তা যদি অন্যের জন্যেও কর তাহলে তুমি পূর্ণ মাত্রায় মুসলমান হতে পারবে। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, মারেফুল হাদীস খণ্ড-২, পৃষ্টা-১৪৮)

সামাজিক জীবনের জন্য উপদেশ

● এই জগৎ সংসার হল ঈশ্বরের পরিবার। যে মানবজাতির সেবা করে, ঈশ্বর তাকে ভালোবাসেন। (মিশকাত, তর্জুমানে হাদীস, খণ্ড-২, ২৩৯)

● কিছু মানুষকে ঈশ্বর মানবসেবার জন্য সৃষ্টি করেন। মানুষের যখন ওই ব্যক্তির প্রয়োজন হয় তখন তার কাছে দৌড়ে যায়। এই ধরনের জনসেবক যারা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। (তাবরানী কবীর: ১৩৩৩৪, আব্দুল্লাহ বিন উমার)

● পয়গম্বর (সা.) বলেছেন, তুমি পৃথিবীবাসীদের প্রতি ভালোবাসা প্রদান কর এবংউপকার কর তাহলে যিনি উর্ধ্বাকাশে

আছেন, তিনি তোমাকে ভালোবাসবেন এবংউপকার করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

● ওই ব্যক্তি মুসলমান নয় যার আচরণে তার প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়। (বুখারী)

● ঈশ্বর, পয়গম্বর এবংশাসকের নির্দেশ পালন কর। (পবিত্র কুরআন ৪:৫৯)

● মানুষ নিজের বন্ধুর ধর্ম (এখানে আচরণ) অনুসরণ করে থাকে। এজন্য প্রত্যেকের এ ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত যে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

(অর্থাৎ দুষ্টু ও অপরাধীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না।)

● যে সমাজেন্যায় থাকবে না, সে সমাজেহিংসার ঘটনা বেশি হবে। (মুয়াত্তা-১৬৭০)

● তোমার কর্মই তোমার শাসক। তোমার কর্ম যেমন হবে, তেমনই সে তোমার উপর রাজত্ব করবে। (জওয়াহিরে হিকমাত)

● মানবজাতি চিরুনির দাঁড়ার মতো। (জাওয়াহিরে হিকমাত)

(সমগ্র মানবজাতি সবাই একেবারে সমান সমান। জাতপাতের কোনও ভেদাভেদ নেই)।

হে মানুষরা! ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনা করতে থাক, তাহলে ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে সহজতা (কোনও ধরনের কাঠিন্য ছাড়া) দান করবেন এবংপবিত্র জীবন দান করবেন। তোমাদের হৃদয়কে ধনী (প্রশস্ত) করে দেবেন। কিন্তু তোমরা যদি অবজ্ঞা অবহেলা কর তাহলে তোমাদের ব্যস্ততা কম করবেন না এবংতোমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতাও দূর করবেন না। (ইবনে মাজাহ-৪১০, তিরমিযী-২৪৬৬)

(যে ঈশ্বরের প্রার্থনা করে না, কর্মব্যস্ততা থেকে তার কখনও অবসর মিলবে না। এবংসচ্ছল হওয়ার পরিবর্তে দান-ধর্ম কিংবা খুশি মনে খরচ করার মতো বাড়তি সম্পদ তার কাছে কখনও থাকবে না)

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, পয়গম্বরদের মধ্যে আমি সর্বশেষ পয়গম্বর। এখন আর কোনও পয়গম্বর আসবে না। এবংএই যুগের পর (কিয়ামত পর্যন্ত) আমাকে শেষ পয়গম্বর রূপে এবংএক ঈশ্বরকে সকলের বিশ্বাস করতে হবে। তাহলেই মুক্তি পাবে। (মুসলিম, মুনতাখাব-এ-আওওয়াব, খণ্ড-১, পৃষ্টা-৭০)

● যদি সমুদ্রের ভিতর আঙুল ডুবিয়ে নাও তাহলে আঙুলে লাগা জল সমুদ্রের জলরাশির তুলনায় যতটুকু কম, আমাদের এই পার্থিব জীবন পারলৌকিক জীবনের তুলনায় ততটাই।

(মুসলিম, তিরমিযী,তরজুমানে হাদীস, খণ্ড-১, পৃঃ ২৬) (অর্থাৎ পরলোকের জীবন অনন্ত।

● ইসলাম ধর্ম স্বীকার (গ্রহণ) করে নেওয়ার পর, ইসলাম গ্রহণের পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ঈশ্বর ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম, মুনতাখাবে আবওয়াব, খণ্ড-১ পৃঃ ৮০) (ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী পাপ কাজের হিসাব হবে।)

ব্যবসা সংক্রান্ত উপদেশ

● সর্বদা ইতিবাচক চিন্তাভাবনা কর। এমনকি যদি তোমার বিশ্বাস জন্মায় যে, এখনই কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে এবংতোমার কাছে যদি টাকা পয়সা থাকে ও সেই অর্থ লগ্নি করার যত সময় হাতে আছে তাহলে তা লগ্নি করে দাও, (আদাবে মুফরাদ, উর্দু-৪৭৯)

● আবশ্যকীয় ঈশ্বর উপাসনার পর নিজপরিবারের ভরণপোষণের জন্য অর্থ উপার্জন করাও আবশ্যক। (তিবরানী কবীর-৯৭৫১) (অর্থাৎ নামায, রোযা, যাকাত, হজএসব তো অবশ্যই পালন করতে হবে। এর সাথে সাথে সম্মানজনক মাধ্যম থেকে অর্থ উপার্জন করাও আবশ্যক। কোনও পীরবাবা ইত্যাদি হয়ে অর্থ উপার্জন করা অপরাধ।)

● সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করার জন্য, নিজের মাতাপিতার সেবা করার জন্য এবংনিজের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততীদের ভরণপোষণের জন্য যদি কেউ উত্তম পন্থায় অর্থ উপার্জন করে তাহলে তার ওই কাজঈশ্বর-উপাসনার সমতুল্য। (তিররানী)

● ঈশ্বর বরকত (উন্নতি)-কে বিশ ভাগে ভাগ করেছেন। ১২ ভাগ দিয়েছেন ব্যবসাতে এবংচাকুরিজীবীকে দিয়েছেন একভাগ। (কানজুল আমাল ১৬/৪, রাকমুল হাদীস-৯৩৫৪)

● ঈশ্বর যে মাধ্যম থেকে তোমার রুজিরুটির ব্যবস্থা করেন সেটা ওই সময় পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তা থেকে উপার্জন বন্ধ হয়ে যায় অথবা অন্য কোনও সমস্যা না দেখা দেয়। (ইবনে মাজাহ, কানজুল আমাল-৯২৬৬)

(নতুন ব্যবসা খুঁজতে থাকো কিন্তু পুরাতন মূল ব্যবসা বন্ধ করে নয়)

● যে দাস (সে যুগে এর প্রচলন ছিল) সে তোমার ভাই, ঈশ্বর তাকে তোমার সেবার জন্য রেখেছেন। যদি ঈশ্বর এক ভাইকে অন্য ভাইয়ের সেবার জন্য নিয়োজিত করেন তাহলে ধনবান ভাইয়ের উচিত সেবক ভাইয়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। তাকে তাই খাওয়াও, যা তুমি খাও। তাকে সেই পোষাক পরাও যা তুমি পরিধান কর। তার কাছ থেকে কোনও শক্ত কাজনিতে হলে তাকে সহায়তা কর। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)।

● পৃথিবীর গোপন ভাণ্ডারে নিজের রুজিঅন্বেষণ কর। (কানজুল আমাল, খঃ-২, পৃ: ১৯৭)

● শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ)

● যে কাজকরবে, উত্তম পদ্ধতিতে করবে। (মুসলিম, হাদীসে নববী নং৩৬৫)

● বৈধ পদ্ধতিতে উপার্জন কর। (মুসতাদরাক হাদীস-২১৪)

● কাউকে ধোকা দিয়ো না। (ইবনে মাজাহ-২২৫০)

● দ্বিতীয়বার ধোকা খেয়ো না। (বুখারী, মুসলিম)

● মিথ্যা কথা বলো না, (বুখারী, মুসলিম)

● নিজের বিক্রিত দ্রব্যের গ্যারান্টি প্রদান কর। (ইবনে মাজাহ-২২৬৫)

- কারো ক্ষতি করো না। (ইবনে মাজাহ-২২৪৮)
- কাউকে শোষণ করো না। (ইবনে মাজাহ-২২৫৩)
- নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর (পরিত্র কুরআন ৫:১)
- যখন মাল সামগ্রী ওজন করবে, সঠিকভাবে করবে। (একটু বেশি অর্থাৎ ঝুল দিয়ে)। (তিরমিযী-২৩০৫)
- মূল্যবৃদ্ধি করার জন্য মালকে মজুত করে রেখো না। (ইবনে মাজাহ-২২২৯)
- সুদ নিয়ো না, সুদ দিয়ো না। সুদ লেনদেনকারীর সহায়তা করো না। (মিশকাত)
- নিজের লেনদেনের লিখিত রেকর্ড রাখো। (তিরমিযী, পবিত্র কুরআন ২:২৮২)
- গাছে ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে সমস্ত ফলের দাম ধরে অগ্রিম ব্যবসা করবে না। (ইবনে মাজাহ-২২৬৫, ২২৯৪)
- মাল বিক্রির সময় ফিক্সড রেট পদ্ধতি অনুসরণ করো। (ইবনে মাজাহ-২২৬৯)
- যে জিনিস তোমার আয়ত্বে রয়েছে কেবল সেই জিনিসেরই ব্যবসা করো। (ইবনে মাজাহ)।
- হাজাম হয়ো না। (ইবনে মাজাহ-২২৪২)
- চিত্রকর হয়ো না। (ইবনে মাজাহ-২২২৭)
- অভিনেতা হয়ো না। (তিরমিযী, সাফিনায়ে নাজাত-২৩৭)
- যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও কারবার (ব্যবসা) করো না। (মুত্তাফাকুন আলাইহে)
- মদ, জুয়া, জ্যোতিষ শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত-- এ ধরনের কোনও ব্যবসা করো না। (মুত্তাফাকুন আলাইহে)
- নাচগানের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যবসা করো না। (মুত্তাফাকুন আলাইহে)।
- যে ব্যক্তি চুরি করা মাল ক্রয় করে এবংসে জানে যে এটা চুরির মাল, তাহলে চুরি করার পাপের অংশীদার হবে। (মুসতাদরাক-২২৪৫)।
- ব্যবসার মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে যেয়ো না। (তিরমিযী)। (পরিবার, সমাজএবংধর্মের জন্যও সময় দিতে হবে।)
- পাপ করার ফলে ঈশ্বর পাপীর রুজিছিনিয়ে নেন। (মুসলিম-৩৭২১, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)
- সকালে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকলে রুযি কমে যায়। (মুসনাদে আহমাদ- খ:-১ পৃ: ৭৩)
- যে সম্পদ থেকে যাকাত (দান) বের করা হয় না, সে সম্পদ বরবাদ হয়ে যাবে। (মিশকাত, সাফিনায়ে নাজাত-

৬০)

- ঋণ থেকে দূরে থাক, কেননা এ হ'ল রাতে চিন্তার ও দিনে অপমানের কারণ (উপকরণ)। (জওয়াহীরে হিকমত)।
- যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে ঋণ নেয় এবংঋণ পরিশোধ করার বাসনা রাখে, ঈশ্বর তার ঋণ পরিশোধে সাহায্য করবে। আর যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে ঋণ নেয় এবংআগে থেকেই তার এরাদা ছিল ঋণ পরিশোধ না করার, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করে দেবেন। (বুখারী, মারেফুল হাদীস, খণ্ড-২, পৃ: ৯৯)
- ঘুষ দাতা এবংঘুষ গ্রহীতা উভয়কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) লানত করেছেন (অভিশাপ দিয়েছেন)। (আবু দাউদ, তরজুমানে হাদীস, খণ্ড-১, পৃ: ২৯৯)

মহিলাদের প্রসঙ্গে তাঁর উপদেশ

- হযরত মুহাম্মদ সা. বলেন, 'কন্যাদের ঘৃণা করো না, কেননা তারা খুব মমতাময়ী ও মুবারক (শুভ) হয়।' (মুসনাদে আহমাদ-১৭৩৭৩)
- তিনি বলেন, মহিলাদের সঙ্গে সম্মানজনক ও নম্র ব্যবহার কর। (জাওয়ামাউল কালাম)
- তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হ'ল সে, যে তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার ও আচরণে সর্বোত্তম। (তিরমিযী-১১৬২)
- তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দু'জন কন্যাকে উত্তমরূপে লালন পালন করবে সে স্বর্গে আমার নিকটবর্তী হবে। (ইবনে মাজাহ-৩৬৭০)।
- হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন যার কোনও কন্যা কিংবা বোন আছে আর সে তাদের প্রতি পুত্রতুল্য ভালো ব্যবহার করে তাহলে আল্লাহ তাকে স্বর্গ দান করবেন। (আবু দাউদ-৫১৪৬)।
- হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন, নিজের স্ত্রীর জন্য উত্তম পদ্ধতিতে খাদ্য ও পোষাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। (মুসলিম-৩৭২১)।
- পরপুরুষদের আকর্ষণ করার জন্য অলংকার সজ্জিতা হয়ে এবংসুগন্ধ ব্যবহার করে রাস্তায় বের হওয়া মহিলাদের জন্য পাপ। (আবু দাউদ, তিরমিযী)
- মহিলারা নিজেদের চোখ অবনত রাখবে। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করবে না। বক্ষের উপর ওড়না ঢেকে দেবে এবংনিজেদের সতীত্বকে রক্ষা করবে। (পবিত্র কুরআন ২৪:৩১)
- মহিলারা যখন ঘর থেকে বের হবে তখন যেন নিজেদের উপর চাদর ঢাকা দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না (পবিত্র কুরআন ৩৩:৫৯)
- তোমাদের সমাজেযারা বিধবা, তাদের বিবাহ সম্পাদন কর। (পবিত্র কুরআন, ২৪:৩২)

মানবজাতির উদ্দেশ্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শেষ পয়গাম (বার্তা)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ হজেযে উপদেশাবলী মানুষদের উদ্দেশ্যে পেশ করেছিলেন তার প্রধান দিকগুলি বর্ণনা করা হয়েছে–

● ঈশ্বর এক। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নন। তাঁর কোনও সঙ্গী (শরীক) নেই। ঈশ্বর তাঁর ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করেছেন, কেবল তিনিই সমস্ত অধার্মিক শক্তিকে পরাজিত করেছেন। (এবংইসলাম ধর্মকে প্রসারিত করেছেন)

● হে মানুষরা। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে একজন নারী এবংএকজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর পৃথক পৃথক সম্প্রদায় এবংগোষ্ঠীতে বন্টন করে দিয়ছেন, যেন তোমার একে অপরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানীয় ব্যক্তি সে, যে ঈশ্বরকে সবথেকে বেশি ভয় করে। না কোনও আরব অনারবের থেকে মহান (বা শ্রেষ্ঠ), আর না কোনও অনারব আরবের ব্যক্তির থেকে মহান (বা শ্রেষ্ঠ)। কালোর উপর সাদার কোনও প্রাধান্য নেই, সাদার উপর কালোর কোনও প্রাধান্য নেই। (অর্থাৎ জাতপাতের কোনও ভেদাভেদ নেই)। মাহাত্ম্য ও মর্যাদা কেবল ঈশ্বর-ভীতি ও পবিত্র আচরণের উপর নির্ভরশীল।

● হে মানুষরা! আজহজের দিন। এটা (হজের) মাস এবংএই মক্কা শহর যেমন সম্মানীয় তেমনই তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান (ইজ্জত) একে অপরের কাছে সম্মানীয়। (অর্থাৎ একে অপরের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষতি করো না)

● হে মানুষরা! আমার পরে (অবর্তমানে) পথভ্রষ্ট হয়ো না। একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না। সমস্ত মুসলমান পরস্পর পরস্পরের ভাই। নিজেদের দাসদের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে। তাদের তাই খেতে দেবে যা তোমরা খাও। তাই পরতে দেবে যা তোমরা পরিধান কর।

● মুসলমান হওয়ার পূর্বের সমস্ত শত্রুতাকে আমি শেষ করে দিচ্ছি। আমার গোত্রের একটা হত্যার বদলা নেওয়া বাকি ছিল, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

● মুসলমান হওয়ার পূর্বে যে সূদী লেনদেন ছিল, আমি তা মাফ করে দিচ্ছি। আমার চাচা হযরত আব্বাস যে ঋণ দিয়েছিলেন, তার সমস্ত সূদকে আমি মা'ফ করে দিলাম (এখন থেকে কেউ সূদ নেবে না, সূদ দেবে না)।

● হে মানুষ সকল! আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এখন কেউ কোনও ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করবে না। (অর্থাৎ সম্পত্তির অংশ পরিবারের মধ্যে কার কতটা হবে তা ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। এখন নিজের ইচ্ছামতো কেউ মৃত্যুর সময় কাউকে তার প্রাপ্য অংশে কম বা বেশি করবে না।)

● সন্তান তার, যার বিছানায় (বাড়িতে) জন্ম হয়েছে। ব্যাভিচারকারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা। সুবিচার আল্লাহর দরবারে হবে। যে কেউ তার পরিবারের সম্পর্কে মিথ্যা বলবে তার প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত।

● ঋণ গ্রহণ করলে, তা পরিশোধ করবে।

● কোনও জিনিস যদি কিছু সময়ের জন্য ধার নিয়ে থাক, তাহলে তা ফিরিয়ে দাও।

● যদি উপহার গ্রহণ করে থাক, তাহলে উপহার দিতেও থাক।

● যদি কারুর জামানত নিয়ে থাক, তাহলে নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। (তার পক্ষ থেকে জমিমানা আদায় কর)।

● বলপ্রয়োগে কারও কোনও বস্তু নিয়ো না।

● নিজেনিজের সঙ্গে এবংঅন্যের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করো না।

● যদি কোনও কুৎসিত হাবশী (নিগ্রো)কে তোমাদের শাসক (আমীর) বানিয়ে দেওয়া হয়, আর সে যদি ঈশ্বর-বিরোধী কোনও আদেশ না দিয়ে থাকে, তাহলে তার আদেশ মান্য করা তোমাদের জন্য আবশ্যকীয়।

● আমার পর আর কোনও পয়গম্বর আসবে না। এবংতোমরা শেষ উম্মত (সম্প্রদায়)।

● স্ত্রীর জন্য এটা জায়েয নয় যে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ অন্য কাউকে দেবে।

● স্ত্রীর উপর স্বামীর এবংস্বামীর উপর স্ত্রীর কিছু অধিকার (কর্তব্য) রয়েছে। স্ত্রীর কর্তব্য হ'ল, সে ব্যভিচারী হবে না এবংএমন ব্যক্তিকে তার ঘরে প্রবেশ করাবে না যাকে তার স্বামী পছন্দ করে না।

● যদি স্ত্রী ব্যভিচারী হয় তাহলে তাকে লঘু দণ্ড দাও, যাতে তার সংশোধন হয়ে যায়। তারপর তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর। তাকে ভালো খাদ্য খাওয়াও। কেননা তারা তোমাদের উপর নির্ভরশীল। স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক ঈশবেরর নাম নেওয়ার পরই (বিবাহ হওয়ার পর) বৈধ হবে। এজন্য স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে ঈশ্বরের নির্দেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

● এখন থেকে অপরাধী নিজেই তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে। পিতার অপরাধের শাস্তি ছেলে ভোগ করবে না এবংছেলের অপরাধের শাস্তি পিতা ভোগ করবে না।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন: 'হে মানুষ সকল! তিনটি বিষয় হৃদয়কে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখে (পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ হতে দেয় না)।

১) যে কোনও কাজের উদ্দেশ্য শুদ্ধ হতে হবে। (কর্মে আন্তরিকতা)।
২) সবসময় অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজকরবে। (দ্বীনি ভাইয়ের প্রতি হিতাকাঙ্খা)
৩) পরস্পরের মধ্যে সহমত বজায় রাখবে। (একতাবদ্ধতা বজায় রাখা)।

● হে মানুষরা! মাসগুলিকে আগুপিছু করো না। (অর্থাৎ বছরে বারোটা মাস, এটাকে ১২ মাসই রাখ। কিছু মাস অথবা দিন জুড়ে দিয়ে চান্দ্র মাসকে সৌর মাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ো না।)

● হে মানুষরা! ঈশ্বরের আদেশ আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাছে দুইটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। যদি তোমরা এই দুইটি জিনিসকে ধরে থাক, তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এই

দুইটি জিনিস স'ল– আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন) এবংআমার সুন্নাত (আমার জীবন পদ্ধতি)।

● হে মানুষরা! নিজের মালিকের প্রশংসা করবে। পাঁচবার নামায পড়বে। একমাস রোযা (উপবাস) রাখবে। যাকাত আদায় করবে। হজকরবে। নিজেদের শাসকের (আমীরের) আনুগত্য করবে। এমনটা যদি কর তাহলে তোমরা স্বর্গ লাভ করতে পারবে।

● হে মানব সকল! যারা এখানে আমার কথা শুনছো, তারা এই কথাকে সেইসব মানুষদের কাছে পৌঁছে দেবে যারা এখানে নেই। হতে পারে যে, যারা এখানে উপস্থিত নেই তারা তোমাদের থেকে অধিক বোধসম্পন্ন এবংস্মরণকারী। (খুৎবা হুজ্জাতুল বিদা)

৫. একক ঈশ্বরের অস্তিত্ব: তার প্রমাণ

আপনি কি ঈশ্বরকে মানেন না? (বিশ্বাস করেন না?)

– না।

কোনও ব্যাপার নয়।

আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব, অনুগ্রহ করে আপনি সেগুলির জবাব দেবেন।

● বিংশ শতাব্দীতে (১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ) বৈজ্ঞানিকরা এ বিষয়ে অবগত হয়েছেন যে, প্রথম অবস্থায় প্রচণ্ড গরম ছোট একটি বস্তু ছিল। সেটা এক বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আর এইভাবে বিস্তারিত হয়ে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। এটাকে বিগ ব্যাংথিওরি বলা হয়। যখন সেটা কিছুটা ঠাণ্ডা হল তখন গরম ধুম্রপুঞ্জের মতো হয়ে গেল। তারপর আরও ঠাণ্ডা হল, তখন এ থেকে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি হল। পৃথিবীর সমগ্র অংশ প্রথমে জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। তারপর জলের তল থেকে পৃথিবী উপরে জেগে উঠল। জল থেকে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে।

● পবিত্র কুরআন ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথমাবস্থায় পৃথিবী ও আকাশ সব উত্তপ্ত ধুম্রপুঞ্জ ছিল। ঈশ্বর তা থেকে পৃথিবী ও আকাশ নির্মাণ করেছেন। (পবিত্র কুরআন ৪১:১১)

অতএব যে সত্য এবংতথ্য বৈজ্ঞানিকরা বিংশ শতাব্দীতে জানতে পারলো তা ১৪০০ বৎসর পূর্বে পবিত্র কুরআনে কিভাবে বর্ণিত হল?

এ ধরনের কিছু সত্য বিষয়, তথ্যাবলী এবংপ্রশ্ন নিম্নে পেশ করা হল।

● বৈজ্ঞানিকরা ঊনবিংশ (১৮০০ খিষ্টাব্দ) শতাব্দীতে অনুমান করলেন যে, সমস্ত সজীব প্রাণীর উদ্ভব পানি থেকে হয়েছে। ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআনে ঈশ্বর বলেছেন, সমস্ত জীবিত প্রাণীকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। (পবিত্র কুরআন-২১:৩০)

● প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা ছিল যে, সূর্য এবংচন্দ্র উভয়েই মশালের মতো জ্বলতে থাকে ও আলো বিকীরণ করতে থাকে। একাদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করলেন যে, একমাত্র সূর্যের নিজস্ব জ্বলন্ত উপকরণ রয়েছে, যার মাধ্যমে আলো প্রকাশিত হয়। চন্দ্র কেবল সূর্যের আলোকে আলোকিত হয় মাত্র। এই তথ্য ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ পূর্বে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। (পবিত্র কুরআন-২৫:৬১)

● প্রাচীনকাল থেকে মানুষের ধারণা ছিল যে, পৃথিবী স্থির অবস্থায় আছে। সূর্য চন্দ্র এবংগোটা ব্রহ্মাণ্ড এই পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে।

১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান বৈজ্ঞানিক Johnannas Kepler এই সত্যের সন্ধান

দিলেন যে, সমস্ত গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে এবংনিজেদের অক্ষের উপর আবর্তন করছে। বিংশ শতাব্দীতে জানা গেল যে, সূর্যও স্থির নয়। সূর্যও নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে এবংসমস্ত গ্রহমণ্ডলীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি সেকেণ্ড ১৫০ মাইল গতিতে সৌর শীর্ষবিন্দুর (সোলার অ্যাপেক্স) চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে। এবংএকবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগবে ২০০ মিলিয়ন বৎসর।

১৪০০ বৎসর পূর্বে এই সত্যতাকে ঈশ্বর কুরআনে লিখে দিয়েছেন যে, সূর্য এবংচন্দ্র এরা সবাই নিজনিজঅক্ষের উপরে বিচরণ করতে থাকে। (পবিত্র কুরআন-২১:৩৩)

● সূর্যের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাসের সংমিশ্রণজনিত বিক্রিয়া (ফিউসন) হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে সূর্য থেকে আলোকশক্তি ও কিরণ নির্গত হয়। যখন সূর্যের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস শেষ হয়ে যাবে তখন এই ফিউসন প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে সূর্য ঠাণ্ডা হতে শুরু করবে। সেটা তখন গোলাপী রঙের গ্যাসের একটা গোলকে পরিণত হবে। এই গ্যাস প্রসারিত হতে হতে পৃথিবীকেও তার মধ্যে নিয়ে নেবে। সেই সময় আকাশ গোলাপী রঙের মতো দেখতে হবে। এবংপৃথিবীতে সব সময়ের জন্য দিন হবে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিকরা এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন। অথচ ১৪০০ বৎসর পূর্বেই কুরআনে একথা লেখা হয়েছে। (পবিত্র কুরআন-৫৫:৩৭)

(আর সে দিনটা হবে কিয়ামত অর্থাৎ মহা প্রলয়ের দিন)।

● প্রাচীনকাল থেকে মানুষদের ধারণা ছিল যে, আকাশে দুইটি নক্ষত্রের মাঝে আর কিছুই নেই। কয়েক বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিকরা সন্ধান পেয়েছেন যে, তাদের মধ্যবর্তী স্থানে প্লাজমা রয়েছে। (Plasma is fourth state of matter)

অথচ ১৪০০ বৎসর পূর্বেই কুরআনে একথা লেখা হয়েছে যে, তাদের মাঝেও কিছু আছে। (পবিত্র কুরআন-২৫:৫৯)

● ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে Edwin Hubble আবিষ্কার করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যে ছায়াপথ (গ্যালাক্সি) রয়েছে, সেগুলি একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিংবা সেগুলি ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ছে।

'আমি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রসারিত করছি'। এ কথা ঈশ্বর ১৪০০ বৎসর পূর্বে পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। (পবিত্র কুরআন-৫১:৪৭)

● যে কোনও পদার্থের সবথেকে ছোট কণাকে অ্যাটম বলা হয়। প্রাচীনকালে এটাকে অন্য নামেও বলা হত। যেমন ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইত্যাদী। কয়েক বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, এ্যাটমের থেকেও ছোট কণাও (Particle) আছে, যাকে সাব এ্যাটোমিক পার্টিকেল বলা হয়।

১৪০০ বৎসর পূর্বে ঈশ্বর এই তথ্যকে পবিত্র কুরআনে লিখে দিয়েছিলেন যে, এ্যাটম-এর থেকেও ছোট ছোট পার্টিকল-এর অস্তিত্ব রয়েছে যা ঈশ্বরের জ্ঞানসীমার গোচরে আছে। (পবিত্র কুরআন-৩৪:৩)

● পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে

যেখানে সমুদ্রের পানি দুই ধরনের। আর এই দুই ধরনের পানি একে অন্যের সঙ্গে মিশে যায় না, বরংসম্পূর্ণ পৃথক থাকে। এমনটা ভূমধ্যসাগর (Meditaranian Sea) এবংআটলান্টিক মহাসাগরে দেখা যায়। আর এই তথ্য মানুষ জেনেছে ১০০ বৎসর পূর্বে। অথচ এই তথ্য ঈশ্বর ১৪০০ বৎসর পূর্বেই পবিত্র কুরআনে লিখে দিয়েছেন। (পবিত্র কুরআন-২৫:৫৩)

● এই পৃথিবী যার উপর আমার চলাফেরা করি। যদি আমরা আমাদের পায়ের তলায় ১০০ কিমি খনন করি তাহলে নীচে থেকে গরম লাভা বের হয়ে আসবে। ভূপৃষ্ঠের (সারফেস) ১০০ কিমি পর্যন্ত মাটির স্তর রয়েছে। এই ১০০ কিমি মাটির স্তর আবার বেশ কয়েকটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। যখন এই স্তরগুলি একটি অন্যটির থেকে পিছলে যায় কিংবা স্থানচ্যুত হয়ে যায় তখন ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীতে যে পাহাড় পর্বতগুলি রয়েছে সেগুলি খুঁটির মতো দুই স্তরের ভিতরে প্রোথিত হয়ে আছে এমন ভাবে যে, এগুলি এক স্তর অন্য স্তর থেকে পিছলে যাওয়া কিংবা তাদের স্থানচ্যুতি হওয়াকে আটকায়।

এই সত্যতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকরা অবগত হয়েছেন বিংশ শতাব্দীতে। অথচ ১৪০০ বৎসর পূর্বে এই তথ্য কুরআনে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (পবিত্র কুরআন-৭৯:৩২)

● স্ত্রীর গর্ভের বাচ্চা ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা পুরুষের বীর্যের (স্পার্ম) উপর নির্ভর করে। ক্রোমোজোমের ২৩তম জোড়া থেকে যদি পুরুষের বীর্য থেকে এক্সএক্স জোড়া তৈরী হয় তাহলে ছেলের জন্ম হবে।

সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে, এটা মায়ের উপর নয় বরংবাবার উপর নির্ভর করে। এই সত্য ও তথ্য বৈজ্ঞানিকদের সবেমাত্র বিংশ শতাব্দীতে অবগতিতে এসছে। অথচ এই তথ্য ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে। (পবিত্র কুরআন-৭৫:৩৫-৩৯, ৫৩:৪৫-৪৬)

● অনুরূপভাবে জল, হাওয়া, পাহাড়, পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ, মানুষের শরীর ও তাদের জন্ম ইত্যাদীর ব্যাপারে সমস্ত সত্য ও তথ্যাবলী যা বৈজ্ঞানিকরা কয়েক শতাব্দী পূর্বে গবেষণা করে আবিষ্কার করেছে, ঈশ্বর ১৪০০ বৎসর পূর্বে সেসব পবিত্র কুরআনে লিখে দিয়েছেন।

● এ ধরনের ৮০টিরও অধিক বৈজ্ঞানিক তথ্য কুরআনে বিদ্যমান যেগুলি হারুণ ইয়াহ্ইয়া তাঁর 'আল্লাহস মিরাকেলস্ ইন দি কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে দি কুরআন এ্যান্ড মডার্ন সায়েন্স নামে ড. যাকির নায়েকেরও একটি বই আছে।

● পবিত্র কুরআনে কি লেখা আছে আর এগুলি কিভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীকে প্রমাণ করে এ বিষয়টা বোঝার জন্য হারুণ ইয়াহ্ইয়া এবংড. যাকির নায়েকের বইগুলি পড়ুন, তারপর পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করুন। এতে আপনার জন্য কুরআন বুঝতে পারা সহজহয়ে যাবে।

● যাঁরা এক ঈশ্বরকে মানেন না, তাঁরা বলুন—এইসব তথ্যাবলী যা কেবল একজন বৈজ্ঞানিক আধুনিক যন্ত্রপাতি ও গবেষণার মাধ্যমে অবগত হতে সক্ষম, সেগুলি ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআনে কিভাবে লেখা হল?

● এসব তথ্যকে কেবলমাত্র তিনিই জানতে সক্ষম যিনি এসবের সৃষ্টিকর্তা। ঈশ্বর এসব সৃষ্টি করেছেন, এজন্য ঈশ্বর এসব কিছু জানেন। এ থেকে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। পবিত্র কুরআন ঈশ্বরই অবতীর্ণ করেছেন। এজন্য এসব তথ্য ও সত্য ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা এসব এখন অবগত হয়েছেন।

এক ঈশ্বর অনন্তকাল থেকে রয়েছেন এবংঅনন্তকাল থাকবেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। এটা নিজেনিজের থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি।

ঈশ্বর সত্য ও সঠিক। তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থ কুরআনও সঠিক ও সত্য। এই গ্রন্থ যাঁর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তিনিও সত্য এবংতিনি ঈশ্বরের দূত।

[Allah's Miracles in the Quran]
Publisher's: Goodword Books
1 Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013
Tel.-4182 7083, 4652 1511, Fax: 011 4665 1771
E-mail: info@goodwordbooks.com

The Quran & Modern Science Compatible or incompatible?
Publishers: Islamic Research Foundation
56/58, Tandel Street (North), Dongri, Mumbai-400 009, India
Tel. 91-22-2373 6875, Email-islam@irf.net
Website: www.irf.net

এই বই আপনি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।
www.freeeducation.co.in]
****

৫. পয়গম্বর কারা ?

ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন 'মানুষ এবংজ্বীন সম্প্রদায়কে আমি আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।' (পবিত্র কুরআন-৫১:৫৬)

ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'মানুষরা কি মনে করে নিয়েছে, তাদের শুধু এটুকু বলার কারণেই ছেড়ে দেওয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবংতাদের পরীক্ষা করা হবে না?'(পবিত্র কুরআন-২৯:২)

(অর্থাৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া কেউ স্বর্গলাভ করতে পারবে না।)

ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'যদি ঈশ্বর চাইতেন তাহলে তোমাদের সকলকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত করে দিতেন, কিন্তু তিনি পৃথক পৃথক জাতি এবংসম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। অতএব ভালো কাজেতোমরা একে অপরের প্রতিযোগিতা কর।' (পবিত্র কুরআন-৫:৪৮-এর সারাংশ)

ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আমি প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য আমার পয়গম্বর (বাণী বাহক) প্রেরণ করেছি।' (পবিত্র কুরআন-১০:৪৭)

শয়তান ক্রমাগত মানুষদের বিভ্রান্ত করতে থাকে, এজন্য দয়াবান ঈশ্বর প্রতি যুগে নিজের দূত অর্থাৎ পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যারা মনুষ্য জাতিকে পরীক্ষায় সফল হওয়ার পন্থা এবংমুক্তির পথ বলে এসেছেন।

তাহলে পয়গম্বররা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি যাঁরা আমাদের স্বর্গলাভ করার সঠিক পথ অবগত করাতে থাকেন।

পয়গম্বর কে সৃষ্টি করেন

ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমার আকৃতি দান করেছি।' (পবিত্র কুরআন-৭:১১)

বিদ্বানগণ এই কথার অর্থ এরকম করেছেন— ঈশ্বর প্রথমে সমগ্র মানবজাতির আত্মা সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেই আত্মাগুলির দেহ সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন— ''যখন তোমার প্রতিপালক পয়গম্বর আদমের পৃষ্ঠ হতে তার বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। আপনি আমাদের প্রতিপালক। (এটা এ জন্য করা হয়েছিল) যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন না বল যে, 'এ সম্পর্কে আমরা অজ্ঞাত ছিলাম। অথবা তোমরা এ কথা না বল যে, 'পূর্বে আমাদের পিতৃ-পুরুষরাই শির্ক (ঈশ্বরের সঙ্গে অন্যান্য উপাস্যদের উপাসনা করা) করেছে আর তাদের পরে আমরা তাদেরই সন্তানাদি (যা করতে দেখেছি তাই করছি) তাহলে ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা যা

করেছে তার জন্য কি আপনি আমাদের শাস্তি দান করবেন? (পবিত্র কুরআন-৭:১৭২-১৭৩)

● পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই প্রতিশ্রুতি নেওয়ার প্রক্রিয়াও সেই সময়কার যখন মানুষ কেবল আত্মাস্বরূপ ছিল এবংসে সময় এখনকার যে শরীর তার রূপদান করা হয়নি।

● যেভাবে ঈশ্বর সমস্ত মানুষের আত্মাকে তাদের শরীর সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টি করেছিলেন সেইভাবে ঈশ্বর পয়গম্বর কিংবা প্রেরিত পুরুষগণকে মনুষ্য জন্মের পূর্বে সৃষ্টি করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি (বাক্য) এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'এবংআমি যখন নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, আর (হে মুহাম্মদ) তোমার কাছ থেকেও, আর নূহ (মনু), ইবরাহীম, মূসা এবংমারইয়াম পুত্র ঈসা থেকেও। আমি তাদের কাছ থেকে নিয়েছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।' (পবিত্র কুরআন-৩৩:৭)

● অর্থাৎ এই পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির পূর্বেই ঈশ্বর পৃথিবীতে কিয়ামত (প্রলয়) পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সমস্ত মানুষের আত্মাগুলিকে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, আর সেই সময়েই সমস্ত পয়গম্বরগণের আত্মাগুলিকেও সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষও যে যার নির্ধারিত সময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে চলেছে। আর মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য পয়গম্বরগণও ক্রমান্বয়ে এসেছেন।

● কিন্তু যেভাবে মানুষ কঠোর তপস্যা করে সন্ত, সাধু, মহাপুরুষ অথবা ক্ষমতাবান হয়ে যায়, সেভাবে কোনও কঠোর তপস্যা করে পয়গম্বর হয়ে যেতে পারবে না। কেননা পয়গম্বরকে স্বয়ংঈশ্বর নিযুক্ত করেন। এবংসমস্ত পয়গম্বরকে ঈশ্বর কোটি কোটি বৎসর পূর্বেই নিযুক্ত করে রেখেছেন। ঈশ্বরের এই পয়গম্বর নিযুক্ত করার কর্মে মানুষের কোনও দখল নেই। এটা ঈশ্বরের একতরফা সিদ্ধান্ত।

● ঈশ্বর যেসব আত্মাগুলিকে পয়গম্বররূপে নিযুক্ত করেন, তিনি তাঁদেরকে সবথেকে ভালো এবংসম্মানিত বংশ, সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব, সর্বোত্তম আচরণ, পবিত্র বিচারবোধ এবংজ্ঞানও দান করেন। এর কারণ হল এটা যে, মানবজাতি কোনও পয়গম্বরের আদর্শ ও শিক্ষাকে নিজেদের জিদের বশবর্তী হয়ে না মানলেও এ কথা বলে কোনও পয়গম্বরকে যেন অস্বীকার করতে না পারে যে, এই পয়গম্বর নীচু জাতের মানুষ কিংবা তাঁর চরিত্র মন্দ। কিংবা তাঁর বোধবুদ্ধি নেই অথবা তিনি মূর্খ। কিন্তু মানুষ এমনটা কখনও বলতে পারবে না। সমস্ত পয়গম্বরগণ সর্বোত্তম বংশোদ্ভূত, চরিত্রবান, ব্যক্তিত্ববান এবংবুদ্ধিমান ছিলেন।

এই বাস্তব তথ্যকে ঈশ্বর কয়েকবার পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত করেছেন।

পয়গম্বরদের পাপ থেকে ঐশী ক্ষমতায় মুক্ত রাখা

● ঈশ্বর পয়গম্বরগণকে বিশেষভবে সৃষ্টি করেন এবংজন্মগ্রহণ করান। সেই সঙ্গে ঈশ্বর সমস্ত ধরনের ভুল ভ্রান্তি ও পাপকর্ম থেকে তাঁদেরকে রক্ষা করেন।

এ কথার প্রমাণ কুরআনে উল্লেখিত হযরত ইউসূফ (আ.)-এর জীবনীতে পাওয়া যায়। নীচে তার বর্ণনা দেওয়া হল।

● হযরত ইউসূফ (আ.) কেনান-এ জন্মগ্রহণ করেন। দাসরূপে তাঁকে মিশরে বিক্রী করে দেওয়া হয়। মিশরের রাজার এক মন্ত্রী তাকে কিনে নেন এবংনিজের পুত্রের ন্যায় তাঁর প্রতিপালন করেন। যখন তিনি বড় হলেন, তখন নিতান্তই আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর প্রতি মন্ত্রীর স্ত্রী যুলেখা অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। একবার ওই রমণী হযরত ইউসূফ (আ.)কে নিজের কামরায় ডাকলেন ও দরজা বন্ধ করে দিলেন এবংইউসূফ (আ.)এর সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। ঈশ্বরের সাহায্য ছিল, হযরত ইউসূফ (আ.) ওখান থেকে মহিলার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সফল হলেন। এই ঘটনাকে ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

'যখন সে (হযরত ইউসূফ) তার পরিপূর্ণ যৌবনে পৌঁছল, তখন তাকে বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম, আমি সৎ কর্মশীলদের এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে (মহিলাটি) তার থেকে অসৎ কর্ম কামনা করল। সে দরজাগুলো বন্ধ করে দিল আর বলল, 'এসো'। সে (ইউসুফ) বলল, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি আমার থাকার ব্যবস্থা কত উত্তম করেছেন, যালিমরা কক্ষণো সাফল্য লাভ করতে পারে না। সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল আর সে (ইউসূফ)ও তার প্রতি আসক্ত হয়েই যেত যদি সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখতো। আমি তা দেখিয়েছিলাম তাকে অসৎ কর্ম ও নির্লজ্জতা থেকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, সে ছিল বিশুদ্ধহৃদয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।' (পবিত্র কুরআন-১২:২২-২৪)

(অর্থাৎ ঈশ্বরই হযরত ইউসূফ (আ.)কে অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করেছেন)।

● আমরা সাধারণ মানুষ যখন কোনও ভুল করি তখন দু'জন ফেরেশতা, যারা সবসময় মানুষের কাছেই থাকে, সেই ভুল-ভ্রান্তি লিপিবদ্ধ করে নেয়। তারপর কিয়ামতের দিন আমাদের কৃত পাপ ও পুণ্যের ভিত্তিতে ফায়সালা হবে।

কিন্তু পয়গম্বরদের এমনটা হয় না। ঈশ্বর পয়গম্বরগণের প্রতি পদক্ষেপে সঠিক পথনির্দেশ দান করেন। কিন্তু যদি তাঁরা কোনও বড় ভুল করে থাকেন তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে শাস্তিও প্রদান করেন।

পয়গম্বরগণের প্রতি পথনির্দেশ

পয়গম্বরদের প্রতি পথনির্দেশ ও দণ্ড বিধানের উদাহরণ নিম্নরূপ:

● বিত্তশালী মানুষদের সমাজেপ্রভাব প্রতিপত্তি থাকে। তারা যা করে এবংবলে সমাজতা শোনে এবংঅনুসরণ করে। একটা গোত্রের সরদার মুসলমান হয়ে গেলে গোটা গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। এজন্য যখন কোনও সরদার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আসত, তখন তিনি তাকে আদর আপ্যায়ন করতেন এবংখুবই একাগ্রতার সঙ্গে তাকে নিজধর্মের শিক্ষা দান করতেন।

একবার কয়েকজন সরদার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলো

'হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি, তার থেকে তোমার পদস্খলন ঘটাবার ব্যাপারে এরা কোনও প্রকার চেষ্টা থেকে বিরত থাকেনি, যাতে করে তুমি আমার সম্পর্কে কিছু মিথ্যা কথা বানাতে শুরু কর। তাহলে এরা তোমাকে বন্ধু বানিয়ে নিত। যদি আমি তোমাকে অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের দিকে সামান্য কিছুটা হলেও ঝুঁকে পড়তে। তাহলে এ জীবনে ও মৃত্যু পরবর্তীকালে আমি তোমাকে দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাতাম, অতঃপর তুমি আমার বিরুদ্ধে তখন কোনই সাহায্যকারী পেতে না।' (পবিত্র কুরআন- ১৭:৭৩-৭৫)

সারাংশ

এই আলোচনার সারাংশ হ'ল– ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই পয়গম্বরদের নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি পয়গম্বরদের সর্বোত্তম বংশ, ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও বুদ্ধি দান করেছেন।

পয়গম্বরদের জীবনকালে ঈশ্বর পয়গম্বরদের সত্যপথ প্রদর্শন করে থাকেন এবংসমস্ত রকমের পাপাচার থেকে তাঁদেরকে সুরক্ষা দান করেন।

এবংযদি কোনও পয়গম্বর জেনেবুঝে ঈশ্বরের আদেশকে অমান্য করে থাকে অথবা পাপকর্ম করে তাহলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দান করে থাকেন।

পৃথিবীতে এমনটা কখনও হয়নি যে, কোনও পয়গম্বর সারাজীবনে পাপ করেই যাচ্ছেন অথচ তিনি পয়গম্বর রূপে থেকে গেছেন।

পৃথিবীতে ১ লাখ ২৪ হাজার পয়গম্বর আগমন করেছেন এবংকেউই কোনও খারাপ কাজকরেননি।

● ধর্মের কোনও গ্রন্থ যতই সম্মানীয় হোক না কেন, যদি তার মধ্যে লেখা থাকে যে, পয়গম্বর কোনও ভুল কাজকরেছেন কিংবা পাপ করেছেন তাহলে ওই গ্রন্থ ভুল হতে পারে কিন্তু পয়গম্বর পাপ কাজকরতে পারেন না।

****

● ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृत
(Rig veda 8:73:6)

सत्य के मार्ग को दुष्कर्मी कभी पार नहीं कर पाते। अर्थात, जिसके क्रम ग़लत होंगे वह कभी सफल न होगा।

এবং হুজুর সা. তাদেরকে কিছু বোঝাচ্ছিলেন। সেই সময় এক অন্ধ গরীব মুসলমান সাহাবা (আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম)ও সেখানে এলো এবং ধর্ম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে লাগলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মনে করলেন, সরদারদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে নিই তারপর অন্ধ সঙ্গী (সাহাবা)-র উত্তর দেওয়া যাবে। ধর্ম শেখার ব্যাপারে সরদারদের ততটা আগ্রহ ছিল না যতটা ছিল ওই অন্ধ ব্যক্তির। আর ঈশ্বর চায় যে, ধর্ম শেখার আগ্রহ যার বেশি সর্বাগ্রে তাকেই জ্ঞান শেখাতে হবে। ঈশ্বর তখনই পবিত্র কুরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ করে (৮০:১-১১) হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে সঠিক পদ্ধতি শেখালেন। (তিরমিযী)

পয়গম্বরগণের প্রতি ঐশী দণ্ড

● পয়গম্বরগণের শাস্তি প্রদানের উদাহরণ এইরকম:

হযরত ইউনুস (আ.) নিনেবাহ (Neneveh) সম্প্রদায়ের জন্য পয়গম্বর ছিলেন। নিনেবাহ বাগদাদ থেকে ২৫০ কিমি দূরে অবিস্থিত। তিনি ওই সম্প্রদায়কে অনেক বোঝালেন কিন্তু তারা মানল না। পরিশেষে হযরত ইউনুস (আ.) ওই সম্প্রদায়ের জন্য বদ্‌দোয়া (অভিসম্পাত) করলেন এবং ওখান থেকে অন্য দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ঈশ্বর তাকে অন্য দেশে যাওয়ার নির্দেশ দেননি। আর তিনি ঈশ্বরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাচ্ছিলেন। এজন্য ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত ইউনুস (আ.) একটি নৌকায় চড়ে যাচ্ছিলেন। সমুদ্রে যখন তুফান আসল এবং নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল তখন মাঝি ইউনুস (আ.)কে সমুদ্রে ফেলে দিল। তখন বিশাল একটা মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। এইভাবে ঈশ্বর তাঁকে একটি বড় মাছের পেটের মধ্যে তাঁকে বন্দী করে ফেললেন। হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি তওবা (অনুশোচনা) করলেন, তারপর কোনও স্থানে নিয়ে গিয়ে ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করলেন। অন্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত তিনি মাছের উদরে বন্দী থাকতেন। (পবিত্র কুরআন-২১:৮৭)

● ঈশ্বর যে শিক্ষা বা ধর্মসহ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণ করেছিলেন তা হল এই যে, 'ঈশ্বর এক এবং তাঁর কোনও অংশীদার নেই। এই জন্য জগৎ-সংসার সৃষ্টি করার, তার সঞ্চালন ও পরিচালনার জন্য অন্য কারও সহায়তা নেওয়ার কোনও আবশ্যকতা নেই ঈশ্বরের। মক্কার লোকেদের বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বর তো একজনই কিন্তু আরও বহু দেবদেবী তাঁকে সহায়তা করে। আর এই বড় মতভেদ ছিল মুসলমান ও মক্কাবাসীদের মধ্যে।

একজন মুসলমানের মনে যখনই এই বিশ্বাস জন্মাবে যে, ঈশ্বরের কোনও সহায়ক আছে তাহলে তখন সে আর মুসলমান থাকবে না। মক্কার সর্দাররা একটা ষড়যন্ত্র করছিল। তারা চাইছিল যে, ঈশ্বরের সহায়ক আছে একথা মুসলমানরা নেনে নিক। এজন্য তারা শান্তি এবং সদ্ভাবনার কথা বলত---'আমরা তোমাদের কিছু কথা মেনে নেবো আর তোমরা আমাদের কিছু কথা মেনে নাও। আর দেব-দেবীদের কিছু মর্যাদা দিয়ে দাও।' এই ঘটনার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এইভাবে দেওয়া হয়েছে।

৭০. পয়গম্বরদের শত্রু কারা?

হযরত যাকারিয়া (আ.)

হযরত যাকারিয়া এক মহান পয়গম্বর ছিলেন। ঈশ্বর এক, তাঁর এই শিক্ষা (বাণী) মানুষের ভালো লাগেনি। মানুষরা তাঁকে হত্যা করতে চাইলো। তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন কিন্তু তিনি দুর্ভাগ্যবশত এমন জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে আত্মগোপন করার কোনও জায়গা ছিল না। তিনি একটা গাছের কাছে আশ্রয় চাইলেন। পয়গম্বরের কথা গাছ কি করে ফেলতে পারে! গাছ মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবংহযরত যাকারিয়া তাঁর মধ্যে মিশে গেলেন। শয়তান এই দৃশ্য দেখছিল। যখন লোকেরা তাঁর পিছু ধাওয়া করতে করতে সেখানে পৌঁছাল তখন শয়তান ইশারা করে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর লুকিয়ে থাকার জায়গা লোকদের দেখিয়ে দিল। আর সেই লোকেরা করাত দিয়ে গাছকে হযরত যাকারিয়া (আ.) সমেত চিরে ফেলল। এইভাবে এক মহান পয়গম্বরের জীবনাবসান হল।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)

হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-ও একজন শ্রদ্ধেয় পয়গম্বর ছিলেন। তিনি যেখানকার পয়গম্বর ছিলেন সেখানকার রাজা (হাইরো অ্যান্টিপাস) নিজের ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাইছিলেন। পয়গম্বরের কাজহল– যখন কোনও অনাচার হতে থাকে তখন লোকদের সাবধান করে দেওয়া। এজন্য তিনি রাজাকে বললেন: আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করা আপনার উচিত নয়। এ কথা ভাইঝি এবংতার মা (হাইরো ডিয়াস)-এর খুব খারাপ লাগল এবংতারা রাজার কাছে হযরত ইয়াহইয়ার মাথাকে উপহার স্বরূপ দাবি করল। রাজা ওই দুইজনকে খুশি করার জন্য হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর মাথাকে দেহ থেকে আলাদা করে দিল এবংতাদের সামনে উপহার স্বরূপ পেশ করল।

হযরত ঈসা (আ.)

হযরত ঈসা (আ.)-ও একজন মহান পয়গম্বর ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর ঐশী ক্ষমতায় ঈসা (আ.)কে বিনা পিতায় সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি যখন দোলনায় ছিলেন তখন থেকেই মানুষদের সঙ্গে কথা বলতেন এবংঈশ্বরের বাণী মানুষদের কাছে পৌঁছাতেন।

ঈশ্বর তাঁকে বহু অলৌকিক শক্তি দান করেছিলেন। তিনি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিতেন। মাটির পাখি তৈরী করে ফুঁ দিতেন এবংপাখি জীবিত হয়ে উড়ে যেত। এমনকি তিনি মৃত মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশে জীবিত করে দিতেন।

বাইবেলের একটি শ্লোক আছে 'হযরত ঈসা (আ.) বললেন: তোমরা এমনটা ভেবো না যে, আমি পুরাতন ধর্মকে নষ্ট করতে এসেছি, বরংআমি তো সেই ধর্মকে স্থাপিত

করতে এসেছি। (বাইবেল: সেন্ট ম্যাথ্যু, ৫:১৭)।

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে হযরত মুসা (আ.) লোকদের যে ধর্ম শিখিয়েছিলেন, হযরত ঈসা (আ.) ওই শিক্ষাই মানুষদের দিয়েছিলেন এবংধর্মের মধ্যে যে ভ্রান্তি ও অনাচার প্রবেশ করেছিল তা দূর করেছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষদের মধ্যে নিরন্তর ধর্মশিক্ষা দিতে থাকেন। কিন্তু সমাজের কিছু লোকের তাঁর শিক্ষাকে ভালো লাগেনি। তারা এক ষড়যন্ত্র রচনা করল এবংবিদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে ঈসা (আ.)কে গ্রেফতার করিয়ে দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করল।

মানুষ পয়গম্বরদের শত্রুতা কেন করে?

● এখানে তো তিনজন মাত্র পয়গম্বরের বর্ণনা পেশ করা হল কিন্তু বাস্তবে মানুষরা হাজার হাজার পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। কিন্তু পয়গম্বরদের হত্যা কেন করা হয়? ওইসব মহান পয়গম্বরগণ কি পাপ করেছিলেন? আসুন এই বিষয়ে আমরা কিছু জানবার চেষ্ট করি।

● রাজনীতি হল একটা ব্যবসা। কোটি কোটি টাকা উপার্জন করা এবংক্ষমতা প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য মানুষ নেতা হয়। এই রকম ধার্মিক গুরু সাজাও এক ধরনের ব্যবসা। এর মাধ্যমেও প্রচুর ধনসম্পদ, প্রতিপত্তি ও সম্মান পাওয়া যায়।

খ্রিষ্টীয় পোপদের এক হাজার বৎসর অবধি ইউরোপে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁদের আদেশ অমান্য করার অথবা তাঁদের বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করার সাহস ছিল না কোনও ইউরোপীয় রাজার।

এই অবস্থা প্রত্যেক ধর্ম এবংপ্রত্যেক দেশের বা অংশের ধর্মীয় গুরুদের ছিল।

কোনও পয়গম্বরের আগমনের সাথে সাথেই এই সমস্ত ধর্মীয় গুরুদের ব্যবসাগুলি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য এই ধরনের লোকেরা সবসময় পয়গম্বরদের বিরোধিতা করে এসেছে।

● সমাজেবিত্তশালীদের মধ্যে অনেকেই গরিবদের শোষণ করে ধনোপার্জন করে। পয়গম্বরদের আগমনের উদ্দেশ্য হল— গরীবদের শোষণ বন্ধ হোক, অত্যাচার নির্মূল হোক, সর্বত্র ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক। ধনীরা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও শোষণের কারবার বন্ধ হতে দিতে চায় না। ফলে এই ধনীকবর্গরাও সবসময় পয়গম্বরদের শত্রুতা করে এসেছে।

● পয়গম্বরদের নির্যাতন করা, তাঁদের বদনাম করার এই অপকর্মগুলি তাঁদের জীবনযাপনের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় না। বরংওই পয়গম্বরদের ধর্ম এবংশিক্ষার প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে হ্রাস করানোর জন্য তাঁদের মৃত্যুর পরও ওইসব মানুষরা তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও বদনাম রটানোর কাজজারি রাখে।

তাঁদের বদনাম করার দুটি পদ্ধতি। এক, তারা পয়গম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহে ভ্রান্ত কথাবার্তাকে শামিল করে দেওয়ার চেষ্টা করে। দুই, পয়গম্বরদের চরিত্রহননের অপচেষ্টা করে।

● যা কিছু শিক্ষা হযরত মূসা (আ.) মানুষদের দিয়েছিলেন, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ংতা পালন করতেন এবংমানুষদের উপদেশ দিতেন।

হযরত মূসা আ. স্বয়ংবিবাহ্ করেছিলেন এবংতাঁর বিবাহিত জীবন তাঁর শিক্ষাবলীর এক মহত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। যদি ঈসা (আ.) বিবাহ্ করতেন তাহলে সেটা পাপ হত না। আর না তাতে বদনাম হত। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) ধর্মের পুনঃস্থাপনের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলেন। ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তারপর স্বর্গে চলে গেলেন।

বর্তমান পৃথিবী থেকে তাঁর চলে যাওয়ার ২০০০ বৎসর পরেও মানুষ তাঁর নামে মিথ্যা কল্পকাহিনীর আবতারণা করে যাচ্ছে। আর প্রচার করছে যে, তাঁর একজন গোপন স্ত্রী ছিল যার নাম St. Mary Magdalene। এবংতাঁর একজন গোপন পুত্রও ছিল, যার নাম St. Michael।

এই প্রসঙ্গে Dan Brown একটি পুস্তক রচনা করেন The Vinci Code এই শিরোনামে। এই বিষয়ের উপর একটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে।

ক্যাথলিক চার্চ এই চলচ্চিত্র না দেখার জন্য মানুষদের উপর অধ্যাদেশ জারি করল। কিন্তু যে ব্যাপারে মানুষদের বাধা দেওয়া হয়, মানুষ সে কাজটা বেশি করে।

এইভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রুরা তাঁর শিক্ষাকেও বদলানোর সমূহ প্রচেষ্টা চালালো। হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার প্রায় ২০০ বৎসর পরে বাইবেল লিপিবদ্ধ করা হয়। পুস্তকাকারে বাইবেল লিপিবদ্ধ করার সময় এর মধ্যে এমন কথাও সংযোজন করা হয়েছে যে, একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– বাইবেলে লেখা হয়েছে: হযরত লুত (আ.) সোডুম শহরের জন্য পয়গম্বর ছিলেন। ওখানকার বেশির ভাগ মানুষ সমকামী ছিল। এজন্য ঈশ্বর দুইজন ফেরেশতাকে পাঠালেন যাঁরা হযরত লুত ও তাঁর পরিবারকে বাঁচিয়ে নিলেন। তাঁর (স্ত্রী ব্যতিরেকে)। এবংগোটা শহরকে জ্বলন্ত গন্ধক বর্ষণ করে ধ্বংস করে দিলেন। এবংসবাই মারা গেল।

এই ঘটনার পর হযরত লুত (আ.) তাঁর দুই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁর দুই কন্যা যখন বুঝতে পারল যে, তাদের বিবাহ করার মতো কোনও পুরুষ বেঁচে নেই, তখন তারা তাদের পিতাকে (লুত আ.)কে অত্যধিক পরিমাণে মদ পান করালো এবংতাঁর সঙ্গে রাত কাটালো। এইভাবে তারা দুইজনেই গর্ভবতী হয়ে গেল। (Bibel, Genesis Chp. 19, Verses-30)

বাইবেলে এই যে কথা লেখা হয়েছে। এটা কি সম্ভব? না, কখনোই নয়। কেননা, ফেরেশতারা কেবল একটা শহরকে ধ্বংস করেছিল, গোটা দুনিয়াকে নয়। সেজন্য অন্য শহরে পুরুষ ছিল যাদের সঙ্গে হযরত লুত (আ.)-এর কন্যাদের বিবাহ হতে পারতো। আর সব ধর্মেই মদ হারাম। তাই কোনও পয়গম্বর মদ পান করে মত্ত বেহুঁশ হয়ে যেতে পারে না যার ফলে তিনি বুঝতেই পারবেন না কার সঙ্গে সহবাস করছেন।

● এইভাবে বাইবেলে লেখা হয়েছে,

হযরত দাউদ (আ.) (David) একজন মহান পয়গম্বর ছিলেন। তিনি একদিন খাদ্য ভক্ষণ করতেন এবংএকদিন উপবাসে থাকতেন। ঈশ্বর যবুর গ্রন্থকে তাঁর উপর অবতীর্ণ করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এতই মধুর ছিল যে, যখন তিনি যবুর পাঠ করতেন তখন পাহাড়ও তাঁর সঙ্গে যবুর পাঠ করত। তিনি ফিলিস্তিনের রাজাও ছিলেন। তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান (আ.) পয়গম্বর ছিলেন। তিনিও ফিলিস্তিনের রাজা হয়েছিলেন। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। হযরত দাউদ (আ.) চাইলে ২০০ জন পত্নী রাখতে পারতেন। এ কেমন করে সম্ভব, একজন পয়গম্বর যিনি রাজা ছিলেন এবংতপস্বী মানুষও ছিলেন, তিনি তাঁর একজন সৈনিকের ধোঁকা দিয়েছিলেন? এটা অসম্ভব, কিন্তু বাইবেলে এমনটাই লেখা আছে।

এসবের কারণ কি?

এর কারণ হল, সমাজেসলমন রুশদিদের মতো লোকের উপস্থিতি। সলমন রুশদির বিশেষত্ব কি? তার চিন্তায় যৌনতা এবংধর্ম-বিদ্বেষ ভরপুর হয়ে আছে। ফলে যে ব্যক্তি যৌনতাকে ভালোবাসবে এবংধর্মকে ঘৃণা করতে পারবে সে রুশদির কাছে হিরো। তাকে ব্রিটিশ সরকার স্যার উপাধিতে ভূষিত করেছে। আজযদি রুশদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রশংসা করে কিছু বলে কিংবা লিখতে শুরু করে তাহলে ওই লোকেরা তাকে সন্ত্রাসবাদী বলে প্রচার করে দেবে। সলমন রুশদীর মতে লোকেরা অনেক কিছু ভুলভাল লিখেছেন। আর প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বকারী সমাজতার স্বীকৃতি দিয়েছে এবংজ্ঞাতসারে সে সবকে পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে সংযোজিত করেছে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর বদনাম করে মানুষের কি লাভ?

হযরত ঈসা (আ.)-এর আচরণের উপর জনমনে সন্দেহের উদ্রেক হলে পরে খ্রিষ্ট ধর্মের উপর থেকে জনগণের আস্থা উঠে যাবে।

যখন মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তখন তার শক্তি বেড়ে যায় এবংসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভয় পায় না। মরণের পর ঈশ্বরের সামনে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এই বিশ্বাস যদি মানুষের মনে দৃঢ় হয়ে যায় তাহলে সে পাপ করবে না। এবংজীবনে আরাম আয়েশ কম করবে।

নাস্তিকরা ভীতু হয়। তারা মৃত্যুকে খুব ভয় পায়। মরণের পর স্বর্গলাভের কল্পনা যারা করে না, যেসব মানুষরা ইহজীবনে সমস্ত রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম পেতে চাইবে, তার জন্য পাপের কাজকরতে হলেও। বলতে গেলে সে এক ধরনের পশু হয়ে বেঁচে থাকে।

ইহুদীরা গোটা দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। নিজেদের কামনা-বাসনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাদের গোপন পরিকল্পনা রয়েছে। যাকে প্রোটোকল বলে।

এই প্রোটোকলে লেখা রয়েছে যে, যদি তুমি সমাজের উপর কর্তৃত্ব করতে চাও তাহলে মানুষের মন থেকে ধর্মবিশ্বাস নির্মূল করে দাও। এই ধরনের পরিকল্পনা বেশ কয়েকটি ধর্মীয় সংস্থা এবংপ্রগতিশীল দেশেরও রয়েছে।

ধর্মহীন মানুষ পশুর মতো হয় এবংভীতু হয়, এরা কেবল নাস্তিকদের উপর রাজত্ব করতে পারে। কেননা ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ যতই গরীব হোক না কেন অন্যায়ের সামনে সে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

যারা পৃথিবীতে মানুষের উপর রাজত্ব ও প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়, পয়গম্বরদের বিরুদ্ধে বদনাম করাটা তাদের এক চক্রান্ত। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবংমুসলমানরাও এই চক্রান্তের শিকার। কেননা, বর্তমান বিশ্বে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হল মুসলমান।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিচিতি তুলে ধরার জন্য এই পুস্তক লেখা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা বহু কল্পকাহিনী ও মিথ্যা বর্ণনা তাঁর জীবনীতে জুড়ে দিয়েছে এবংপ্রচার করে চলেছে। এই পুস্তকে সে সবের নিরসন করার চেষ্ট করা হয়েছে।
ইসলামের শত্রুরা প্রধানত দুইটি মুখ্য বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অপবাদ দিয়ে থাকে। এক, তাঁর বৈবাহিক জীবন, দুই, শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই দুইটি বিষয়ে আলোচনা করব।
‘প্রোটোকল’ পুস্তকখানি আপনি নিম্নলিখিত প্রকাশনা থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।
আর রহমান প্রিন্টার এ্যান্ড পাবলিশার
১৮, যাকারিয়া স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

****

● Protocol यह पुस्तक आप निम्नलिखित प्रकाशन से प्राप्त कर सकते हैं।
अर्रहमान प्रिंटर व पब्लीशर, १८, ज़करिया स्ट्रीट कोलकत्ता-७०००७३.

৭৭. হযরত মুহাম্মদ (সা.) কি হিংসার শিক্ষা দিতেন?

● মানুষরা অভিযোগ করে যে, হযরত মুহাম্মদ সা. হিংসা-বিদ্বেষের শিক্ষা দিতেন। আসুন দেখা যাক। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হিংসার শিক্ষা দিতেন, না কি স্বয়ংহিংসা-বিদ্বেষ সহ্য করে অহিংসার শিক্ষা দিতেন ?

● ঈশ্বর তাঁর বাণীকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে আদেশ দিয়েছিলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বৎসর। ৬৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ পয়গম্বর হওয়ার শুরু থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত তাঁকে এবংঅন্যান্য মুসলমানদেরকে অস্ত্রের সাহায্যে কারও বদলা নেওয়ার নির্দেশ ঈশ্বর দেননি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবারা হয় হিংসা-বিদ্বেষ সহ্য করেতন, নতুবা মক্কা শহর ত্যাগ করে অন্য কোনও কিংবা শহরে চলে যেতেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেসব হিংসা, অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নলিখিতভাবে পেশ করা হল—

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পয়গম্বর নিযুক্ত করার পর তিন বৎসর যাবৎ ঈশ্বর তাঁকে কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করার আদেশ দিয়েছিলেন। এবংচতুর্থ বৎসর থেকে তাঁকে সার্বজনীনভাবে ভাষণের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করার আদেশ দিয়েছিলেন।

চতুর্থ বর্ষে যখনই তিনি কাবা শরীফের কাছে ধর্মীয় ভাষণ দিলেন, তখনই লোকেরা তাঁকে ঘিরে ফেলল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বাঁচানোর চেষ্টা করেন হযরত খাদীজা (রা.)-র বড় ছেলে হযরত হারিস বিন আবী হালি (রা.) এবংতিনি (হারিস) শহীদ হয়ে গেলেন।

● আবু লাহাব ও উকবা বিন আবু মুয়ীত এই দুইজন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিবেশী ছিল। এরা দুজন সবসময় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘরের মধ্যে নোংরা নিক্ষেপ করত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিদিন খুব ভোরে কাবা শরীফে নামায পড়তে যেতেন, আবু লাহাবের স্ত্রী সেই রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রাখত, যাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কষ্ট দেওয়া যায়।

● আবু লাহাব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আপন চাচা ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুই কন্যার সঙ্গে আবু লাহাবের দুই ছেলের বিবাহ হয়েছিল (কিন্তু বিদায় হয়নি।)

স্তবু লাহাবের চাপে পড়ে দুই ছেলে মুহাম্মদ (সা.)-এর দুই কন্যাকে তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) দিয়ে দেয়। আরব দেশে এ কাজকে খুবই নিন্দনীয় এবংঅপমানকর মনে করা হত।

● পয়গম্বরীর পঞ্চম বর্ষে একবার হযরত মুহাম্মদ (সা.) কাবা শরীফে নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন

তখন উকবা বিন আবী মুয়ীত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘাড়ের উপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিল। সেটি এত ভারী ছিল যে, তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলতে পারলেন না। যখন তাঁর ঘরের লোকজন শুনতে পেল তখন হযরত ফাতিমা (রা.) ছুটে এলেন এবংতাঁর গর্দান থেকে নাড়িভুঁড়ি নামিয়ে দিলেন।

● একবার হযরত মুহাম্মদ (সা.) কাবা শরীফে নামায পড়ছিলেন, তখন উকবা বিন আবী মুয়ীত সেখানে আসল এবংতাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে দিয়ে টানতে লাগল। গলায় চাদর কষে টানার ফলে তাঁর চোখ বের হয়ে পড়ল। হযরত আবুবকর (রা.) মাঝে এসে দাঁড়ালেন এবংহযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে চাদরের ফাঁস থেকে মুক্ত করলেন। উকবা হযরত আবুবকর (রা.)-কেও খুব মারধোর করল।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এক সাহাবা বলেন, মুসলমান হওয়ার পুর্বে আমরা মক্কায় দেখতাম—একজন খুব সুন্দর যুবক, তিনি মানুষদেরকে ইসলামের কথা বোঝাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম— ইনি কে? কোনও একজন বলল: ইনি কুরায়েশ বংশের এক যুবক। এঁর নাম মুহাম্মদ (সা.)। এ বিধর্মী হয়ে গেছে। সকাল থেকে এই যুবক মানুষকে ধর্মের কথা বোঝাচ্ছে। এমনকী এখন সূর্য মাথার উপর এসে গেছে। ইতিমধ্যে একজন মানুষ এসে তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। অন্য একজন তাঁর জামা ছিঁড়ে দিল, তৃতীয় একজন তাঁর মাথায় মাটি ঢেলে দিল। চতুর্থ আর এক ব্যক্তি তাঁর মুখে থাপ্পড় মারল। কিন্তু যুবকের মুখ দিয়ে অভিসম্পাতের একটি শব্দও বের হল না। ইত্যবসরে এক বালিকা কাঁদতে কাঁদতে একটা পানির পেয়ালা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। বলিকাকে কাঁদতে দেখে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল এবংতিনি বললেন, 'তোমার আব্বার জন্য দুঃখ করো না। তোমার আব্বাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন, এবংইসলাম সমস্ত কাঁচাপাকা বাড়িতে পৌঁছাবে।' ওই সাহাবা কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন— এই বালিকা কে? কেউ জবাব দিল— ইনি (মুহাম্মদ সা.)-এর কন্যা যয়নব (রা.)। (বাসীরাতে আফরোয ওয়াকেয়াত, পৃ. ২২)।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এই জ্যেষ্ঠা কন্যা কয়েক বৎসর পর মক্কা থেকে মদীনা যাচ্ছিলেন। আকরামা বিন আবু জাহলও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁর পথ অপরোধ করল এবংতাঁর উটকে যখম করে দিল। ফলে তিনি উটের পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। সে সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তিনি আহত হলেন এবংগর্ভপাত হয়ে গেল। আর এই আঘাতের কারণে কয়েক বৎসর পর তাঁর মৃত্যু হল।

● পয়গম্বরীর সপ্তম বছর, যখন মক্কার সরদাররা অনুভব করল যে, ইসলাম তো প্রসারিত হয়েই চলেছে এবংএকে প্রতিহত করা অসম্ভব তখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গোটা গোত্রকে সামাজিকভাবে বহিষ্কার করে দিল এবংতাঁর গোটা গোত্রকে শহরের বাইরে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য করল।

সামাজিক বয়কটের কারণে এই গোত্রের সমস্ত খাদ্যসামগ্রী শেষ হয়ে গেল। ছোট ছোট শিশুরা যখন জোরে জোরে কাঁদত তখন সেই আওয়াজউপত্যকার বাইরেও পর্যন্ত

শোনা যেত। কতিপয় যুবকরা তো খিদে মেটানোর জন্য চামড়া পর্যন্তও সিদ্ধ করে খেতে লাগল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর গোত্র তিন বৎসর যাবৎ এই কষ্ট স্বীকার করতে থাকলেন। তাঁর স্ত্রী হযরত খাদীজা, যিনি প্রায় ৬৫ বৎসর বয়স্কা ছিলেন এবংতাঁর চাচা আবু তালিব যিনি প্রায় ৮০ বৎসর বয়স্ক ছিলেন—এই সামাজিক বহিষ্কারের ফলে তাঁরা এতটাই দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, সামাজিক বয়কট উঠে যাওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই দুইজনেই মৃত্যুবরণ করলেন।

● পয়গম্বরী পাওয়ার পর দশম বৎসরে হযরত মুহাম্মদ সা. তায়েফ সফর করেন। উদ্দেশ্য ছিল ওখানে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। সেখানকার আব্দিয়া লাইল, মাসউদ এবংহাবীব— এই তিনজন সরদারের আচরণ ছিল খুবই অপমানজনক। তারা কোনও কথাই শুনতে রাজিতো হলই না, এমনকী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তাদের গোত্রের মধ্যে ইসলামের প্রচার করতে দিতে চাইল না। তারা শহরের বদমায়েশ ও দুষ্ট লোকদের হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিছনে লেলিয়ে দিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেদিক যাচ্ছিলেন তারা সেখানেই তাকে বিদ্রূপ করছিল এবংযেখানেই যাচ্ছিলেন সেখানেই তাঁর উপর পাথর বর্ষণ করতে লাগল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) দশ কিংবা বিশ দিন যাবৎ এই মুসিবত সহ্য করতে থাকেন এবংধৈর্য ধারণ করতে থাকলেন। শেষদিন তাদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তারা হাতে পাথর নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হাঁটার জন্য যখন পা ওঠাতেন এবংযমীনে পা রাখছিলেন তখন এই দুষ্কৃতিকারীরা তাঁর গোড়ালি লক্ষ্য করে পাথর বর্ষণ করছিল। কেননা তাদের উদ্দেশ্য হত্যা করা ছিল না, শুধু যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা পাথর নিক্ষেপ করছিল। তিন মাইল পর্যন্ত তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিছু ধাওয়া করতে থাকল এবংপাথর বর্ষণ করতে থাকল। এইভাবে চলতে চলতে তিনি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন এবংআঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়তেন তখন বসে পড়তেন। তথাপিও ওইসব গুণ্ডারা রেহাই দিত না। তাঁকে জোর করে ফের দাঁড় করিয়ে দিত, গালি দিত, তালি বাজাত, আওয়াজদিত এবংতাঁকে চলতে বাধ্য করত। পাথরের আঘাতে তিনি এতটাই চোট পেলেন যে, তাঁর জুতো রক্তে জমাট বেঁধে গিয়েছিল। সারা শরীর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। পরিশেষে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন, হযরত যায়েদ (রা.) তাঁকে নিজের পিঠে তুলে নিয়ে জনপদ থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। (সীরাতে আহমাদে মুজতবা)

● মক্কাতে প্রায় ১৩ বৎসর যাবৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কষ্ট সহ্য করতে থাকলেন। মানুষরা খুবই নিকৃষ্ট আচরণ করত তাঁর সঙ্গে। ভত্যাচারীর দল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিছনে টিটকারী দিয়ে বেড়াত। রাস্তায় চলার সময় গায়ে নোংরা জিনিস ছুড়ে দিত। রাত্রে চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। আবু জেহেল নিজেএকবার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। এইরকম অসংখ্য কষ্ট ও নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন। পয়গম্বরীর ত্রয়োদশ বৎসরে কুরাইশদের অত্যাচারী পশুরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শহীদ করে দেওয়ার বাসনায় সারারাত তাঁর ঘরকে

ঘিরে রাখল। কিন্তু তিনি নিরাপদে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে গেলেন।

● ওহুদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া এত জোরে হামলা করল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখমণ্ডল যখম হয়ে গেল। তাঁর বর্মের দুইটি আংটা গালের মধ্যে ঢুকে গেল। উৎবা বিন আবী ওয়াকাস পাথর ছুঁড়ে মারল, যার ফলে তাঁর নীচের দাঁত ভেঙ্গে গেল এবংঠোঁট কেটে গেল। আব্দুল্লাহ বিন শাহাব যাওহারী পাথর মেরে কপাল রক্তাক্ত করে দিল। হযরত আবু ওবায়েদ ইবনে জাররাহ্ একটা আংটাকে নিজের দাঁতে কামড়ে ধরে এত জোরে টানলো যে, যখন আংটা গাল থেকে বের হ'ল তখন হযরত আবু ওবায়েদ ইবনে জাররাহ-র দাঁতও ভেঙ্গে গেল এবংতিনি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এইভাবে দ্বিতীয় আংটা দাঁতে কামড়ে এতজোরে টানলো যে, আংটা বের হয়ে আসার সময় আবু ওবায়েদের দ্বিতীয় দাঁতও ভেঙ্গে গেল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হওয়া বন্ধ হচ্ছিল না। আহত অবস্থায় কিছু দূরে চলে গেলেন যাতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো যায়। সে সময় আবু আমির ফাসিকের খনন করা গর্তে পড়ে গেলেন। গর্ত করে সে পাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। হযরত আলী রা. ও হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ রা.-র সাহায্যে খুব কষ্টে সেই গর্ত থেকে বের হয়ে উপরে উঠে আসলেন। (সি-সাবে আহমদ মুজতবা)

● এতটা বিদ্বেষ প্রদর্শনের পরও কখনও তিনি তাঁর শত্রুদের অভিশাপ দেননি। মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার আট বৎসর পর যখন তিনি দশ হাজার সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে মক্কাতে পৌঁছালেন, তখন মক্কার যে সমস্ত লোকেরা বিগত ২১ বৎসর যাবৎ তাঁকে এবংতাঁর সাথীদেরকেও সর্বপ্রকারে নির্যাতন করেছিল, কয়েকবার মদীনাতে হামলা করেছিল, হত্যা করতে চেয়েছিল, বিজয় অর্জনের পর তিনি কিন্তু কোনও একজন মানুষের উপরও প্রতিশোধ নিলেন না এবংসকলকে ক্ষমা করে দিলেন। মানব ইতিহাসে এমন দয়া প্রদর্শনের উদাহরণ অন্য কোনও ব্যক্তির জীবনে পাওয়া যাবে কি? কোথাও পাওয়া যাবে না।

অহিংসা প্রসঙ্গে ইসলামের শিক্ষা

এসব তো ছিল উদাহরণ যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কিভাবে হিংসা ও বিদ্বেষকে সহ্য করেছিলেন। এখন এই ইসলামী শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'কোনও মানুষকে হত্যা করলে কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজছাড়া কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করল। যদি কেউ নিরপরাধ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই বাঁচিয়ে দিল।' (পবিত্র কুরআন সূরা মায়িদা: ৩২)

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন : 'পৃথিবীতে (দেশে) বিপর্যয় সৃষ্টি করতে যেয়ো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।'.
(পবিত্র কুরআন সূরা কাসাস: ৭৭-এর সারাংশ)

● হযরত মুহাম্মদ সা. বলেন: তুমি পৃথিবীবাসীদের উপর প্রেম ও উপকার

প্রদর্শন কর। তাহলে যিনি আকাশে রয়েছেন (ঈশ্বর) তোমার উপকার করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশাবলী

● হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন: হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন– 'শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করো না। আর যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন ধৈর্য্য ধারণ করবে।' (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ-৫৩)

● হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন: ওই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না যার দ্বারা তার প্রতিবেশী বিরক্ত হয়। (বুখারী)

● হযরত আব্দুল্লাহ বিন আফী রা. বলেন– একবার যুদ্ধের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সন্ধ্যা পর্যন্ত শত্রুদের আক্রমণের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু শত্রুরা আক্রমণ করেনি। (এবংহযরত মুহাম্মাদ সা.)-ও প্রথমে আক্রমণ করেননি। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সৈনিকদের সম্বোধন করে বললেন– 'যুদ্ধ করার বাসনা পোষণ করো না এবংশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা কর। কিন্তু যদি তোমাদের উপর হামলা করা হয় তাহলে ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা কর এবংসাহসিকতার সঙ্গে লড়াই কর।' (বুখারী ১৫৬)

● হযরত আবু সাঈদ রা. বলেন: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল– 'কোন্ বান্দা (ব্যক্তি) সবথেকে উত্তম এবংকিয়ামত (মহা প্রলয়)-এর দিন আল্লাহর নিকট উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হবে?' হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন: 'আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও নারী।' হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল– 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে এমন ব্যক্তির থেকেও কি ওই ব্যক্তির মর্যাদা বেশি হবে?' হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, 'যদি কোনও ব্যক্তি আল্লাহর শত্রুদের উপর তরবারি চালায়, এমনকি (অনবরত তরবারি চালাতে থাকার কারণে) তার তরবারি ভেঙ্গে যায় এবংসে নিজেও রক্তে রঙীন হয়ে যায় (অর্থাৎ শহীদ হয়ে যায়) তবুও আল্লাহতায়ালার স্মরণকারীর (প্রার্থনাকারীর) স্থান (স্ট্যাটাস) ওই ব্যক্তির (শহীদের) থেকে উঁচুতে হবে।'(আহমাদ, তিরমিযী। খণ্ড-১, মুনতাখাবে আবওয়াব, হাদীস-৪২৯)

● হযরত আবুবকর সিদ্দীক রা. বলেন: এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সা.-কে জিজ্ঞাসা করল– 'সবথেকে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি কে?' (এ কথার অর্থ হ'ল– কোন্ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সফল হবে এবংসম্মানিত হবে?) হযরত মুহাম্মদ (সা.) জবাবে বললেন: 'যে বান্দা লম্বা আয়ু পেল এবংনেক (পুণ্য) কাজকরল।' ওই ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, 'সব থেকে খারাপ মানুষ কে?' (অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি নরকে থাকবে এবংকিয়ামতের দিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে?) হযরত মুহাম্মদ (সা.) জবাবে বললেন: যে ব্যক্তি লম্বা আয়ু পেল এবংখারাপ কাজকরতে থাকল।' (মুসনাদে আহমাদ, মারুফুল আহাদীস-৮২)।

● হযরত ওবায়েদ বিন খালিদ রা. বলেন : দুইজন ব্যক্তি মদীনায় এসে মুসলমান হয়ে গেল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওই দুইজনকে

এক আনসারী (স্থানীয় মুসলমান সাথী) সাহাবার সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর ওই দু'জনের মধ্যে একজনের কয়েকদিনের মধ্যে যুদ্ধে মৃত্যু হয়ে গেল। এক সপ্তাহ পরেই দ্বিতীয় সাহাবারও মৃত্যু হ'ল। (দ্বিতীয় জনের ঘরে মৃত্যু হল কোনও অসুস্থতার কারণে)। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথীরা তার জানাযার নামায পড়লেন এবংদাফন করে দিলেন। জানাযার নামায আদায়কারী সাহাবাদের হযরত মুহাম্মদ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন: 'তোমরা জানাযার নামাযে কি বলেছ?' (অর্থাৎ তোমাদের মৃত ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে কি দোয়া করেছ?) সাহাবারা জবাব দিলেন: 'আমরা তার জন্য এই দোয়া করেছি– আল্লাহ তার মুক্তি দান কর, তার উপর কৃপা কর এবংতার সেই ভাইয়ের সঙ্গী করে দাও যে পূর্বে শহীদ হয়েছিল।' এই জবাব শুনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, 'তাহলে তার (পরে মৃত্যুবরণকারী) ওই নামাযগুলি কোথায় গেল যা সে তার শহীদ ভাইয়ের নামাযগুলির পরে পড়েছিল? তাছাড়া তার ওইসব সৎকর্মগুলি কোথায় গেল যা সে শহীদের কৃত আমলের পরে সম্পাদন করেছিল?' তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন: 'ওই দুইজনের মর্যাদার মধ্যে তার থেকেও বেশি পার্থক্য হবে যতটা আসমান ও যমীনের মধ্যে পার্থক্য।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, মাআরিফুল হাদীস, খণ্ড-২, হাদীস-৮৩)

ব্যাখ্যা : হযরত মুহাম্মদ (সা.) বক্তব্যের অর্থ হ'ল, তোমরা পরের ব্যক্তির স্বাভাবিক ও সাধারণ মৃত্যুকে পূর্বের শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুর তুলনায় কম মর্যাদার মনে করেছ। আর এজন্য তোমরা দোয়া করেছ যে, হে আল্লাহ এই পরে সাধারণ ও স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী ভাইকে পূর্বের শহীদ ভাইয়ের সঙ্গী করে দাও। অথচ পরবর্তী মৃত ভাই শহীদ ভাইয়ের শাহাদাত লাভের পরেও নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে এবংঅন্যান্য সৎকাজকরেছে। এর ফলে তার মর্যাদা পূর্ববর্তী শহীদ ভাইয়ের মর্যদার থেকে বেশি হয়ে গেছে। এমনকি দু'জনের মর্যাদা এবংঅবস্থানের মধ্যে আসমান যমীন পার্থক্য হয়ে গেছে।

এই হাদীসগুলির ভিত্তিতে মূল্যায়ণ করুন। ইসলামের শিক্ষা এটা নয় যে, ধর্মের জন্য জীবন দেওয়া এবংজীবন নেওয়া খুব বড় পুণ্যের কাজ। বরংইসলামের শিক্ষা হল– দীর্ঘ আয়ু পর্যন্ত বাঁচো এবংঈশ্বরের উপাসনা করতে থাকো, তাহলেই সবার শ্রেষ্ঠ হতে পারবে।

● হযরত ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন: হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন, 'সমগ্র প্রাণীজগৎ আল্লাহ পরিবার। আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় সে, যে তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি সৎ ব্যবহার করে।' (মিশকাত, তরজুমানুল হাদীস, খণ্ড-২, হাদীস-২৩৯)

● হযরত আবু হুরাইরাহ রা. বর্ণনা করেন: হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন– হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ছিলাম, কিন্তু তুই আমার দেখাশোনা করিস্‌নি এবংআমাকে খাওয়াস্‌নি ও পানি পান করাস্‌নি।'

ওই ব্যক্তি বলবে' 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনার দেখাশোনা

করতাম! আপনি তো সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক।' আল্লাহ বলবেন, 'কেন, তুই কি জানতিস না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ এবংক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ছিল। যদি তুই তাকে দেখতিস্, খাওয়াতিস এবংপানি পান করাতিস তাহলে আমাকে তার পাশে পেতিস।' (তরজুমানে হাদীস, খণ্ড-২, হাদীস-২৪৫)

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'রাস্তায় যেতে যেতে একজন ব্যক্তির খুব পিপাসা পেল। সে একটা কুঁয়োর কাছে পৌঁছাল। কুঁয়োর মধ্যে নেমে তার তৃষ্ণা নিবারণ করল এবংবাইরে বের হয়ে আসল। বাইরে এসে সে দেখল যে, একটা তৃষ্ণার্ত কুকুর ভিজেমাটি চাটছে। ব্যক্তিটি মনে করল যে, কুকুরটা পিপাসার তীব্রতায় ছটফট করছে, যেমন আমি করছিলাম। এজন্য সে দ্বিতীয়বার কুয়োর মধ্যে নামল। নিজের জুতোয় পানি ভরল। নিজের দাঁতে জুতোকে কামড়ে ধরে কুয়োর বাইরে বের হয়ে আসল এবংকুকুরের তৃষ্ণা মেটাল। এই কাজকে আল্লাহতায়ালা পছন্দ করলেন এবংওই বান্দাকে ক্ষমা করে দিলেন।'

এই বর্ণনা শুনে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) পশুদের সেবা করলেও কি আমরা পূণ্য পাবো?' হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন : 'প্রত্যেক পশুকে (প্রাণীকে) সেবা করলে পূণ্য অর্জন করা যাবে। (অর্থাৎ প্রত্যেক জীবকে সেবা করায় পূণ্য অর্জন করা যাবে)। (বুখারী, খণ্ড-৩, কিতাব-৬৪৬/৪৩)।

● হযরত আনাস রা. বলেন: হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাকে বলেছেন, 'হে প্রিয় পুত্র, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় যে, তুমি এমনভাবে জীবনযাপন করবে যেন কারও প্রতি কোনও ভ্রান্ত ভাবনা-চিন্তা তোমার হৃদয়ে থাকবে না, তাহলে সে ভাবেই জীবনযাপন কর। আর এটাই আমার জীবনযাপনের পদ্ধতি।

যে আমার অনুসরণ করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই, সে আমাকে ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসবে, সে আমার সঙ্গে স্বর্গে থাকবে।' (হাদীস-মুসলিম)

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন : 'মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থায় মুসলমান শাসকদের কর্তব্য হ'ল, তারা অমুসলমানদের জীবন, সম্পদ এবংসম্মানকে রক্ষা করবে। যদি কোনও মুসলমান একজন অমুসলমানের সম্পদকে জোরপূর্বক নিয়ে নেয় কিংবা শোষণ করে অথবা তাকে কোনও কষ্ট দেয় তাহলে কিয়ামতের দিন যখন ঈশ্বরের সামনে সকলের নিজের নিজের কাজের হিসাব দিতে হবে, সেইদিন আমি (হযরত মুহাম্মদ) ওই অমুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করব এবংআল্লাহর আদালতে ওই মুসলমানের বিরুদ্ধে মকদ্দমা লড়ব।' (আবু দাউদ, সাফিনায়ে নাজাত-১৫১)

পবিত্র কুরআনে যুদ্ধের নির্দেশ (শিক্ষা) কেন?

আপনারা দেখলেন যে, ইসলামে কোনও হিংসা বিদ্বেষের শিক্ষা নেই। তাহলে কুরআনে ওইসব আয়াতগুলি কেন রয়েছে, যেগুলিতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে এর কারণ নিম্নলিখিত:

ন্যায় (Justice)

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন ঈশ্বরের বাণী মানুষদের মধ্যে পৌঁছাতে শুরু করলেন তখন হযরত সুমাইয়া রা. ইসলাম গ্রহণ করলেন এবংমুসলমান হয়ে গেলেন।

মক্কার লোকেরা বিশেষ করে সম্পদশালী ও সরদার লোকেরা চাচ্ছিল না যে, কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক। যারা মুসলমান হ'ত তাদেরকে ভয়ানকভাবে নির্যাতন করত। ওই লোকেরা হযরত সুমাইয়া রা., তাঁর স্বামী হযরত ইয়াসির বিন আমির রা. ও তাঁর দুই ছেলের মধ্যে একজনকে নির্যাতন করে শহীদ করে দিয়েছিল।

● এই লোকেরা এক সাহাবীয়াকে উটের চামড়ার মধ্যে বন্ধ করে সেলাই করে দিল এবংপ্রখর রৌদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করল। এভাবে তার মধ্যে তিন দিন যাবৎ তিনি তড়পাতে থাকলেন এবংপরিশেষে মারা গেলেন।

● এই লোকেরা হযরত খাব্বাব রা.-কে উত্তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিল। সেই আগুন তাঁর গলিত চর্বিতে নিভে গেল। হযরত খাব্বাব রা.-র জীবন তো বেঁচে গেল কিন্তু অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্যন্ত তাঁর পিঠে কেবল চামড়া ও হাড় ছিল, মাংস সব পুড়ে গিয়েছিল।

● মানুষ ঈশ্বরের সত্য বার্তা অনুসরণ করে চলুক, একথা মক্কার যেসব লোকেরা চাইত না তারা এক সাহাবিয়াকে উটের চামরার মধ্যে ভরে বন্ধ করে দিল, এবংসেই সাহাবিয়া তিনদিন যাবৎ তার মধ্যে তড়পাতে থাকল এবংপরিশেষে সেই অবস্থায় মারা গেল।

এইরকম হাজার হাজার মানুষ ছিল যাদেরকে ওইসব যাতনা দিত ও অত্যাচার করত। এই লোকদের জন্য ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে নিম্নলিখিত আদেশ অবতীর্ণ করলেন:

● 'কেউ অত্যাচারিত হয়ে নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিলে, তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে, আর অন্যায়ভাবে যমীনে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য্য ধারণ করে, আর (অত্যাচারীকে) ক্ষমা করে দেয়, তাহলে অবশ্যই তা দৃঢ় চিত্ততার (সাহসিকতার) কাজ' (পবিত্র কুরআন ৪২:৪১-৪৩)

● পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলি পুনরায় অধ্যয়ন করে বিচার করুন। এই আয়াতগুলিতে একথা বলা হয়নি যে, তুমি অবশ্যই প্রতিশোধ নাও। বরংবলা হয়েছে, যদি কেউ বদলা নিয়ে নেয় তাহলে কোনও কথা নেই, অন্যথায় ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের যারা নির্যাতন করে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে– ক্ষমা করে দেওয়া খুবই সাহসের কাজ।

আত্মরক্ষা (Self defence)

● যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলেন তখনও মক্কার লোকেরা দুইবার মদীনার উপর হামলা করে। আর তৃতীয় বার গোটা আরবের দশ হাজার সৈনিক একত্রিত করে মদীনার উপর আক্রমণ চালিয়ে দিল। মুসলমানরা কেবল

মাত্র তিন হাজার ছিল। মুসলমানরা এতবড় সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে সক্ষম ছিল না। এজন্য তাঁরা শহরের বাইরে পরিখা খনন করলেন। এভাবে তাঁরা মদীনা শহরকে রক্ষা করলেন। এইসব গোত্রগুলোকে, যারা একত্রিত হয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছিল, এক এক করে যদি পরাজিত না করা হত তাহলে তারা এর থেকেও বড় সেনাদল নিয়ে আক্রমণ করত। এইজন্য তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লড়াই করার নির্দেশ আল্লাহতায়ালা কুরআনে এইভাবে দিয়েছেন–

'হে মুমিনগণ (এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী)! যেসব অবিশ্বাসী তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। যাতে তারা তোমাদর মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায়, আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরু) সঙ্গে আছেন।' (পবিত্র কুরআন : ৯:১২৩)

● এই আয়াতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর যুদ্ধ করতে এজন্য বলেছেন যে, তারা যেন মুসলমানদের শক্তিশালী মনে করে এবংআক্রমণ করতে কিংবা হুমকি দিতে ও নির্যাতন করতে সাহস না পায়। আত্মরক্ষার এটা একটা পদ্ধতি।

কিন্তু প্রত্যেক অমুসলমানের উপর আক্রমণ করার সাধারণ নির্দেশ এটা ছিল না। তাদের জন্য যে নির্দেশ ছিল, তা নিম্নলিখিত:

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন, (তোমরা যুদ্ধ কর কিন্তু) 'মুশরিকদের মধ্যে যারা তোমাদের সঙ্গে চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।' (অর্থাৎ যারা নিজেদের শান্তি-সন্ধিকে ভঙ্গ করেনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না।) (পবিত্র কুরআন-৯:৪)

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে এও বলেছেন 'যদি মুশরিকদের (অমুসলিম) কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর বাণী শোনার সুযোগ পায়, তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও। এটা এজন্য করতে হবে যে, এরা এমন এক সম্প্রদায় যারা (ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে) অজ্ঞ।' (পবিত্র কুরআন-৯:৬)

ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে আরও বলেছেন:

● 'তোমরা আল্লাহর পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (পবিত্র কুরআন ২:১৯০)

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথীদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হাতিয়ার তুলবে না এবংযারা বৃদ্ধ তাদেরকে আঘাত করো না। মহিলা ও শিশুদেরকেও মারবে না। ফলবান বৃক্ষ কাটবে না। কাউকে, কোনও কিছুকে জ্বালিয়ে দেবে না।' (ইবনে কাসীর)

সমাজেআইন ব্যবস্থা বজায় রাখা (Enforcing Law and Order in Society)

● দেশের মধ্যে কোথাও যখন দাঙ্গা শুরু হয়, তখন পুলিশ প্রথমে সেখানে কার্ফু জারি করে। আর মানুষ যখন কার্ফুকে তোয়াক্কা না

করে দাঙ্গাই করতে থাকে তখন সরকার পুলিশকে নির্দেশ দেয়, 'দাঙ্গাবাজদের দেখা মাত্র গুলি চালাও। বিনা মকদ্দমায় কারও উপর দেখা মাত্র গুলি চালানো কত মারাত্মক ও ভয়ানক আইন! কিন্তু সমাজেশান্তি বজায় রাখার জন্য এটা খুবই জরুরী। এজন্য বিশ্বের সবই দেশে এই আইন বলবৎ রয়েছে।

● কতিপয় হিংস্র আরব গোত্র এমন ছিল যারা কোনও ধর্ম মানত না এবংশান্তি ও সন্ধিচুক্তি পালন করত না। তারা সর্বপ্রকারে মুসলমানদের হত্যা করার ফন্দি-ফিকির করত। একবার আযাল ওয়াকারা গোত্র মদীনায় এসে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বলল: 'আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। আমাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য বহু সংখ্যক মুসলমানদেরকে আমাদের গোত্রের কাছে পাঠিয়ে দিন।' হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের কথাকে সত্য মনে করলেন এবং ১০ জন সাহাবাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন তাদের সঙ্গে সেই লোকেরা পথিমধ্যে রাবিয়ার নিকটে আটজন সাহাবাকে হত্যা করল। আর দু'জনকে মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রি করে দিল।

অনুরূপভাবে আবু বারা আমীর নজদ এলাকায় ইসলাম শিক্ষার জন্য ৭০ জন মুসলমানকে চেয়ে নিয়ে গেল এবংবির-এ-মাউনা নামক স্থানে রিগাল এবংজাকুওয়ান গোত্রের লোকেরা একত্রে মিলে ধোকা দিয়ে ৬৯ জন সাহাবাকে শহীদ করে দিল। কেবলমাত্র একজন সাহাবা কোনও রকমে বেঁচে ফিরে এল।

যাদের না ছিল কোনও ধর্ম, আর না ছিল কর্ম। তারা বিলকুল জানোয়ার সদৃশ ছিল তাদের জন্য ঈশ্বর নিম্নোক্ত আদেশ অবতীর্ণ করলেন।

● 'তোমরা সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই কেন করবে না যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, যারা রাসূলকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। প্রথমে তারাই তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তোমরা যাকে ভয় করবে তার সবচেয়ে বেশি হকদার হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।' (পবিত্র কুরআন-৯:১৩)

● 'তারপর (এই) হারাম (পবিত্র) মাস (এমন মাসগুলি যেসময় যুদ্ধ করা হয় না) অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর। তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে ঘেরাও কর, তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু তারা যদি তওবাহ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।' (পবিত্র কুরআন-৯:৫) ('হারাম' শব্দের আরবী ভাষায় অর্থ হ'ল পবিত্র ও সম্মানীয়)

● এই আয়াতগুলিতেও ঈশ্বর মুসলমানদের সবসময় হত্যা করতে থাকার নির্দেশ দেননি। তাদের হিংসাত্মক আচরণের জন্য এই নির্দেশ। সংশোধিত হয়ে যাওয়ার পর তাদের পিছন ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

জনকল্যাণ:

আল্লাহ (ঈশ্বর) মানবজাতির কল্যাণের জন্যও যুদ্ধ করতে বলেছেন। যার ফলে

আল্লাহর (ঈশ্বরের) আনুগত্যকারী মানুষরা অত্যাচারীদের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে সম্মান এবংশান্তির সঙ্গে বসবাস করতে পারে। এবংএক আল্লাহ (ঈশ্বর)কে নির্ভয়ে ও বাধাহীন ভাবে ইবাদাত (প্রার্থনা) করতে পারে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য লড়াই করার আয়াত এইরূপ:

'তোমাদের এ কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহর (ঈশ্বরের পথে) পথে সেসব আসহায় নরনারী ও (দুঃস্থ) শিশু সন্তানদের (বাঁচাবার) জন্যে লড়াই করো না, যারা (নির্যাতনে কাতর হয়ে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের মালিক আমাদের অত্যাচারীদের এই জনপদ থেকে বের করে (অন্য কোথাও) নিয়ে যাও, অতঃপর তুমি আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক (পাঠিয়ে) দাও, তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে একজন সাহায্যকারী পাঠাও।' (পবিত্র কুরআন ৪:৭৫)

এ ধরনের যেকোনও আয়াত কুরআনের মধ্যে আছে তার পিছনে কোনও একটা কারণ আছে, একটা ইতিবাচক উদ্দেশ্য আছে। অন্যথায়, ইসলাম কখনও কোনও নির্দোষ মানুষকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না বরংসর্বপ্রকারে রক্ষা করার নির্দেশ দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুই কোটি মানুষ মারা গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পাঁচ কোটি মানুষ মারা গেছে। ২০০০ সালে ইরাকের উপর আমেরিকার আক্রমণে ২০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল। প্রতি বৎসর মহারাষ্ট্রে ১৫০০ কৃষক আত্মহত্যা করে। প্রতি মাসে মুম্বাইতে ৪৫০ জন মানুষ ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সারা জীবনে যত যুদ্ধ করেছেন তাতে কেবল ১০১৮ জন মানুষ মারা গিয়েছিল। (এদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান) এর থেকেও তো বেশি প্রতি বৎসর মহারাষ্ট্রে কৃষকরা আত্মহত্যা করে। তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যত যুদ্ধ করেছিলেন তাকে কি আপনি যুদ্ধ বলবেন?

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ঈশ্বর ৪০ বৎসর বয়সে পয়গম্বরীর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি ৬৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কিন্তু ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত (অর্থাৎ পয়গম্বরীর প্রথম ১৫ বৎসর) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবংঅন্যান্য মুসলমানদের অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি ছিল না।

যদি ঈশ্বর তাঁকে অবশিষ্ট আট বৎসর অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি না দিতেন তাহলে এই পৃথিবীতে একমাত্র এক ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য একজনও জীবিত থাকত না। যে ধর্মের শিক্ষা হযরত আদম আ., নূহ (মনু) আ., ইবরাহীম আ., হযরত মূসা আ. এবংঅন্যানা পয়গম্বরগণ মানবজাতিকে প্রদান করেছিলেন সে শিক্ষা কবেই শেষ হয়ে যেত।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশাবলী

মহাভারতের কাহিনী অনুসারে কর্ণ একজন সজ্জন পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি পাপী ছিলেন না এবংশ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন, অথচ সেটা ছিল অন্যায় পথ।

● মহাভারতের যুদ্ধে একবার কর্ণের

রথের চাকা মাটিতে পুঁতে গিয়েছিল। কর্ণ অস্ত্র রেখে দিয়ে রথের চাকা মাটি থেকে বের করার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন কর্ণকে হত্যা করার। কর্ণ নিজের ভাই অর্জুনকে বললেন: 'নিয়ম মেনে যুদ্ধ কর।' (নিরস্ত্রের উপর আক্রমণ করা যুদ্ধরীতি বিরুদ্ধ)। অর্জুনের মনে হল– সম্ভবত: নিরস্ত্র কর্ণকে হত্যার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকে যুদ্ধরীতির পরিপন্থী নির্দেশ দিয়েছেন। যখন অর্জুন কিছুক্ষণ যুদ্ধবিরতী দিয়ে ভাবতে লাগলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

'কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম এর নিষ্পত্তি কে করবে? এটা সে করতে পারে না যে নিজেই ভ্রান্ত পথে চলে। নিষ্পত্তি সেই করবে যে নিজেসত্য পথে চলে এবংযে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য বেঁচে থাকে। যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা তোমার উচিত। আর তুমি সেটাই কর।'

'একজন ক্ষত্রিয়ের যে দায়িত্ব, সেটা স্মরণে রেখে তোমার বোঝা উচিত যে, তোমার জন্য সর্বোত্তম কর্ম হ'ল সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা। সুতরাংহে অর্জুন! এ কাজসম্পাদন করতে তুমি পিছপা হয়ো না।' (গীতা, অধ্যায়-২, শ্লোক-৩১)

এবংঅর্জুন তার নিরস্ত্র অগ্রজকর্ণকে হত্যা করল।

'সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ কর।' এই উপদেশ বা শিক্ষা বহু ধর্মের মধ্যে রয়েছে।

আর এটা সন্ত্রাসবাদ নয়, অন্যায়ের কারণে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয় এবংবাড়তে থাকে। বিশ্বে সর্বপ্রথম সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়েছিল স্কটল্যান্ডে।

কেননা, স্কটল্যান্ডের বাসিন্দাদের মনে হয়েছিল যে, ইংল্যান্ড তাদের সঙ্গে ন্যায়-আচরণ করছে না। তারপর ফিলিস্তিনবাসীরা আতংকবাদ বা সন্ত্রাসবাদকে গ্রহণ করল। তাদের মনে হল আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবংইসরাঈল তাদের সঙ্গে ন্যায় করছে না। তারপর শ্রীলংকার তামিল মানুষরা সন্ত্রাসবাদকে গ্রহণ করল, কেননা তাদেরও শ্রীলংকা সরকারের বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ।

সন্ত্রাসবাদ বা আতংকবাদকে নির্মূল করার একটাই রাস্তা। সেটা হল সমাজেসকলের সঙ্গে ন্যায় আচরণ। স্কটল্যান্ডের খ্রিষ্টানদের, শ্রীলংকার হিন্দুদের এবংফিলিস্তিনের মুসলমানদের তাদের ধর্ম তাদেরকে সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেয়নি। ধর্ম সন্ত্রাসবাদ শেখায় না। এসব তো ক্ষমতা ও পদলোভী রাজনৈতিক নেতাদের দুষ্কর্ম, যার ফলশ্রুতিতে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়।

কাফির কারা?

কাফির অর্থ অবিশ্বাসকারী, অস্বীকারকারী। যে ব্যক্তিই ঈশ্বরের আদেশকে ভ্রান্ত বলবে তাকে কাফির বলা হবে। যে কেউ কাফির হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর বলেছেন:- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে আর কোনও পয়গম্বর আসবে না। তারপর যদি মুসলমানদের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় বলে যে, এখনও পয়গম্বর আসতে পারে, তাহলে সেই লোকদেরও কাফির (অস্বীকারকারী) বলা হবে। পাকিস্তানের কিছু মানুষ গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে পয়গম্বর বলে বিশ্বাস করে। এই লোকেরা নিজেদেরকে মুসলমান

বলে কিন্তু বিশ্বের সমস্ত মুসলমানরা তাদেরকে কাফির বলে মনে করে।

মুশরিক কারা?

মুশরিক অর্থ যারা ঈশ্বরের সঙ্গ অন্য কাউকেও উপাস্য এবংতার সমতূল্য ক্ষমতাবান বলে বিশ্বাস করে। তারা শুধু অমুসলমানরা নয় বরংমুসলমানরাও মুশরিক হতে পারে।

যে কেউই এই মনে করবে যে, ঈশ্বর তো দোয়া (নিবেদন) শুনে থাকেন এবংআমাদের কামনা বাসনাকে পূর্ণ করে থাকেন কিন্তু এই পয়গম্বর কিংবা কোনও সাধু বা পীর বাবাও দোয়া শোনেন এবংআমাদের ইচ্ছা পূরণ করেন তাহলে সেই মুসলমানও মুশরিক বলে গণ্য হবে।

ন্ডতএব কুরআনে যাকে কাফির এবংমুশরিক বলা হয়েছে সে কেবল খ্রিস্টান অথবা ইহুদী অথবা হিন্দু নয়, বরংপ্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না কিংবা তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করে সে কাফির অথবা মুশরিক। ভারতবর্ষে এমন লক্ষ লক্ষ মুসলমান রয়েছে যারা প্রকৃতপক্ষে কাফির পর্যায়ের কিংবা মুশরিক।

- হযরত আবুবকর রা. এবংহযরত উমার রা. হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মৃত্যুর পর এ ধরনের হাজার হাজার মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন যারা কাফির ছিল (যাকাত না দেওয়ার কারণে এবংমিথ্যা পয়গম্বরীর দাবি করার জন্য তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল)। সুতরাংকাফির এবংমুশরিক এই শব্দগুলোকে অন্য সম্প্রদায় যেন গালি মনে না করেন।

****

৭২. হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর ১২ জন স্ত্রী কেন ছিল?

এখন আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর আরোপিত অন্য আর একটি বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। আরোপিত অভিযোগটি হল তাঁর বিবাহ সংক্রান্ত।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ১২টি বিবাহ কেন করেছিলেন?

একাধিক বিবাহের অনুমতি সব ধর্মেই রয়েছে। বর্তমান যুগে কেবল একজন স্ত্রী রাখার যে আইন রয়েছে, সে আইন হিন্দু অথবা খ্রিষ্টান অথবা ইহুদী ধর্মের আইন নয়। বরংএটা হল বর্তমান রাজনৈতিক নেতাগণের তৈরী করা আইন।

● হিন্দু ধর্মগনন্থ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ১৬ হাজার-এরও অধিক স্ত্রী ছিল।

হযরত সুলাইমান আ.-এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। (ইবনে মাজাহ, খণ্ড-২, পৃ. ২২)

রাজা দশরথের চারজন স্ত্রী ছিল।

এ রকম অগণিত পয়গম্বর এবংরাজা মহারাজা ছিলেন, যাদের একাধিক স্ত্রী ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ১২ জন স্ত্রী হবেন এটা তাঁর তকদীরে ছিল। এবংএই ভবিষ্যৎবাণী চার হাজার বছর পূর্বে অথর্ববেদে বলা হয়েছে। এই শ্লোকটি হল—

उष्टा यस्य प्रबाहिणी बधुमन्तों द्रिर्दश।
बष्मा रयस्य नि जिहीडेत दिब ईषमाण उपस्पृश: (अथर्ववेद, कुन्ताप सूक्त: २०-२)

অর্থাৎ, যাঁর বাহন হল দুইটি সুন্দর উট। তিনি নিজের ১২জন স্ত্রীসহ উটের পিঠে সওয়ার হন। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা নিজস্ব গতির তীব্রতায় আকাশ স্পর্শ করে নীচে নেমে আসে। (অথর্ববেদ, কুন্তাপ সুক্ত: ২০-২)

(ভাষান্তর ডা. এম এ শ্রীবাস্তব। হযরত মুহাম্মদ আওর ভাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, পৃ. ১৫)

● যদি কিছু লোকের মনে এই বিবাহ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এর মধ্যে কামুকতা ছিল তাহলে বলব— যখন কোনও ব্যক্তি খুব বেশি কামুক হয়, তখন যৌবন থেকেই তার ব্যবহারের মধ্যে কামুকতার লক্ষণ দেখা যায়। কিংবা তার আচরণে অশ্লীলতা প্রকাশ পায়।

বর্তমানে মুসলমানদের থেকে অমুসলমানরা বেশি জানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে। মুসলমানরা ওইসব বইপুস্তক পড়ে যা মুসলমান লেখকরা লেখেন। আর মুসলমান লেখকরা তাদের পয়গম্বরের খারাপ কিছু কেন লিখবে? যদি সজ্জন হয় তাহলে ইহুদী ও খ্রিষ্টান লেখক তো সত্য কথা লিখবে। আর যদি সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হয় তাহলে বিষোদ্গার করতে থাকবে এবংহযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বদনাম করার চেষ্টা করবে।

কিন্তু আজও পর্যন্ত ইতিহাস হ'ল এই যে, লেখক মুসলমান হোক কিংবা খ্রিষ্টান অথবা ইহুদী অথবা অন্য যে কোনও ধর্মের হোক না

কেন এবংতাদের মন-মানসিকতা যতই বিষাক্ত হোক না কেন, তারা সবাই একত্রিত হয়েও হযরত মূহাম্মদ (সা.)-এর পয়গম্বর হওয়ার পূর্বের জীবনে খারাপ চরিত্র ও আচরণের একটাও উদাহরণ পেশ করতে পারবে না।

যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর আচার-ব্যবহার সঠিক ও শালীন না হ'ত তাহলে তাঁর অশ্লীল আচরণের একটাও উদাহরণ ইতিহাসে কেন পাওয়া যায় না?

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) পয়গম্বর রূপে তো এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পূর্বেও ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষরূপে যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেন, যখন তাঁর ৪০ বৎসর বয়স, ঈশ্বর তাঁকে বললেন– 'তুমি পয়গম্বর'। ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি মানুষের মাঝে একজন সাধারণ ব্যক্তিরূপেই ছিলেন।

কিন্তু এই সাধারণ জীবনেও হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে লোকেরা মুহাম্মদ নামে ডাকত না, বরংসম্মানের সঙ্গে সাদিক (সত্যবাদী) এবংআমীন (যে কখনও ধোঁকা দেয় না) নামে ডাকত।

কোনও এক যুবক যদি খুবই কামুক হতো, তাহলে লোকেরা তাকে সাদিক, আমীন নামে কেন ডাকত ?

● ২৫ বৎসর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ হযরত খাদিজা (রা.)-র সঙ্গে হয়েছিল। ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত (অর্থাৎ ২৫ বৎসর যাবৎ তিনি হযরত খাদিজা (রা.)-র সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁদের দুইজনের আল্লাহ দুই পুত্র ও চার কন্যা দান করেছিলেন।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ৫০ বৎসর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-র মৃত্যু হ'ল। তাঁর মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোনও বিবাহ করেননি। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত যয়নব (রা.)-র বিবাহ হয়ে গিয়েছিল এবংতিনি তাঁর শ্বশুরালয়ে ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পালকপুত্র হযরত যায়েদ (রা.)-রও বিবাহ হয়েছিল এবংসে স্ত্রী নিয়ে পৃথক থাকত। এজন্য হযরত খাদীজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘরে কেবল তিনজন স্বল্পবয়সী কন্যা ছিল। গোটা মক্কা শহর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শত্রু ছিল। এজন্য তাঁর সাহাবারা তাঁকে দ্বিতীয় বিবাহ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি তাঁদের কথা মেনে নিলেন। এবং৬৫ বৎসরেরও বেশি বয়স্কা এক বিধবা যিনি খুব লম্বা ও স্থুলকায়া মহিলা ছিলেন, তাঁকে বিবাহ করলেন। তাঁর নাম ছিল হযরত সাওদা (রা.)। অন্য কোনও পত্নী ব্যতিরেকে তিনি হযরত সাওদা (রা.)-র সঙ্গে চার বৎসর পর্যন্ত থাকেন। (অর্থাৎ হযরত সাওদা (রা.) একাকী তাঁর সঙ্গে থাকতেন এবংঅন্য কোনও স্ত্রী ছিল না)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অপবাদ আরোপকারীদের উদ্দেশ্যে আমার প্রশ্ন– হযরত মুহাম্মদ সা.-এর চরিত্র ও আচরণ যদি নির্মল ও স্বচ্ছ না হয় তাহলে তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহ কেন করলেন না? আর যদি বিবাহ করলেনই তাহলে এক বৃদ্ধা বিধবাকে কেন করলেন? আর চার বৎসর যাবৎ একাকী তাঁকেই নিয়ে কেন বা থাকলেন?

● পয়গম্বরদের স্বপ্ন ঈশ্বরের (অবতীর্ণ) আদেশ। যেমন হযরত ইবরাহীম আ. স্বপ্ন দেখেছিলেন এবংনিজের পুত্রকে কুরবানী দেওয়ার মনস্থ করেছিলেন। এই ঘটনার বর্ণনা অথর্ববেদে 'পুরুষমেধা' নামে করা হয়েছে। (অথর্ববেদ ১০-২-২৬) (আমার লিখিত 'পবিত্র বেদ আওর ইসলাম ধর্ম' বইটিও পড়তে পারেন)

● অনুরূপভাবে ঈশ্বর হযরত মুহাম্মদ সা.-কে স্বপ্নে হযরত আয়িশা রা.-কে রেশমের বস্ত্র পরিহিতা কনে রূপে দেখিয়েছিলেন। এটা ঈশ্বরের আদেশ ছিল। (এমন নির্দেশ ঈশ্বর কেন দিলেন, সে প্রসঙ্গে আমি পরে আলোচনা করব।) ফলে যখন লোকেরা হযরত মুহাম্মদ সা. ও হযরত আয়িশা রা.-র মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন তখন তিনি অগ্রাহ্য করলেন না। (তিনি নিজের থেকে এই সম্পর্ক স্থাপন করতে চাননি।)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ হযরত আয়িশা (রা.)-র সঙ্গে হয়ে গেল। সেই সময় হযরত আয়িশা (রা.) সাবালিকা ছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিবাহের পর আয়িশা (রা.)-কে নিজের ঘরে নিয়ে আসেননি। বিবাহের পর হযরত আয়িশা (রা.) তিন বৎসর নিজের মাতাপিতার ঘরেই ছিলেন।

আমার প্রশ্ন হল— যদি হযরত মুহাম্মদ সা. খুব বেশি কামুক হতেন তাহলে তিনি এক যুবতী স্ত্রীকে তাঁর মাতাপিতার ঘরে তিন বৎসর যাবৎ কেন ছেড়ে রেখেছিলেন? হওয়া তো উচিত ছিল এটা যে, বিবাহের পরপরই তাঁকে বিদায় করে নিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে আসা। কেননা, ঘরে যে স্ত্রী ছিলেন তিনি একজন বৃদ্ধা, স্থূলকায়া এবংদীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা। কিন্তু এমনটা হয়নি।

কিন্তু কেন?

হযরত আয়িশা (রা.)-কে বিবাহ করার পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরও ৯ জনকে সঙ্গত কারণে বিবাহ করেছিলেন। যদি আপনার অভিযোগ এই হয় যে, শুধুমাত্র যৌনোন্মাদনার কারণে বিবাহ করেছিলেন তাহলে সেই স্ত্রীদের অনেক সন্তানাদী কেন হয়নি? হযরত খদীজা (রা.)-র মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ৬ সন্তান হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর কোনও অসুস্থতা ছিল না। (হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইনফারটাইল ছিলেন না।) তাঁর একজন স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীগণের মধ্যে কেউ কুমারী ছিলেন না এবংতাঁদের মধ্যে কারও পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত সন্তানাদীও ছিল। অর্থাৎ তাঁরাও বন্ধ্যা ছিলেন না। কিন্তু কেবল হযরত মারীয়া (রা.)-র এক পুত্র সন্তান হয়েছিল। আর কোনও স্ত্রীর কোনও সন্তান হয়নি। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পুত্র সন্তানরা বাঁচত না। কিন্তু কন্যারা জীবিত ছিল। তাহলে তাঁর অনেক বেশি সন্তানাদি কেন হয়নি?

● আমার একটাও প্রশ্নের উত্তর আপনি দলীলসহ দিতে পারবেন না। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর আরোপিত অভিযোগ ও অপবাদ সবগুলিই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। এসব সালমান রুশদীর মতো লোকদের লাগানো মিথ্যাচার যার নিজের কোনও চরিত্রই নেই, আর তার মাথার উপর সবসময় যৌনতার ভূত চেপে বসে রয়েছে। তার চিন্তা-ভাবনায় ঈশ্বর বিরোধী হলাহল ভরপুর।

● হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর এই অভিযোগও আরোপ করা হয় যে, যখন হযরত আয়িশার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় তখন আয়িশা (রা.)-র বয়স ছিল মাত্র ৬ বৎসর।

● এই অভিযোগও মিথ্যা। এই অভিযোগের কারণ হল, হাদীসের এক পুস্তকে এই কথার বর্ণনা রয়েছে।

● যে লোকেরা বলে যে, বুখারীতে যা লেখা হয়েছে সেটাই সত্য, তাহলে তাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা হযরত আয়িশা (রা.) 'ইলমে নিসাব'-এর একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 'ইলমে নিসাব' ইতিহাসের এক বিষয়। এই বিষয়ের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তির বংশ এবংতাদের পূর্বপুরুষদের পরিস্থিতি পেশ করা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে দক্ষ তাদের মধ্যে এই হাজার হাজার ব্যক্তির নাম তাদের পূর্বপুরুষদের নামসহ স্মরণে থাকতে হয়। বর্তমানে আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত তাদের বংশের সমস্ত মানুষের নাম জানি। আর এটা আমরা জানতে পারি 'ইলমে নিসাবের' মাধ্যমে।

হযরত আয়িশা (রা.) সাহিত্যচর্চায়ও পারদর্শী ছিলেন। বহু কবিতা তাঁর স্মরণে ছিল।

● ৬ বৎসর বয়সে একটা শিশু স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হয়ে থাকে সে ঠিকমতো ১০০ পর্যন্ত গণনা করতে পারে না। তাহলে ৬ বৎসর বয়সে আয়িশা (রা.) 'ইলমে নিসাব' ও সাহিত্যে পারদর্শী হলেন কিভাবে?

বিবাহের পর তাঁকে কেউ টিউশানি পড়াতো? কেননা 'ইলমে নিসাব' বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কাউকে পড়াননি। তাহলে এই জ্ঞান তিনি (আয়িশা) কোথা থেকে পেলেন?

তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.) এই বিষয়ে দক্ষ ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি তাঁর কন্যাকে এই জ্ঞান দান করে ইলমে নিসাব শিখিয়েছিলেন।

● হযরত আসমা (রা.) হযরত আয়িশা (রা.)-র বড় দিদি ছিলেন এবংআয়িশা (রা.)-র থেকে দশ বৎসরের বড় ছিলেন। হযরত আসমার মৃত্যু হয়েছিল ইসলামী বর্ষ ৭৩ হিজরীতে ১০০ বৎসর বয়সে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন তাঁর (আসমার) মৃত্যুর ৭৩ বৎসর পূর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত আসমা (রা.)-র বয়স ছিল ২৭ বৎসর। হযরত আয়িশা (রা.) হযরত আসমা (রা.)-র থেকে ১০ বৎসরের ছোট ছিলেন। সুতরাংসে সময় হযরত আয়িশা (রা.)-র বয়স ছিল ১৭ বৎসর।

● হযরত সুলাইমান নাদবী তাঁর গ্রন্থে (সীরাতে আয়িশা, পৃষ্ঠা নং১৫৩) লিখেছেন– হযরত আয়িশা (রা.)-র মৃত্যু হয়েছিল ৬৭ হিজরীতে। সে সময় তিনি ৪০ বৎসরের বিধবা। এই অঙ্কের হিসাবেও জানা যায় যে, বিধবা হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৭ বৎসর। সুতরাংবিবাহের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৬ বৎসর।

● যদি আমরা হযরত আয়িশা (রা.)-র বিবাহের সময়কার বয়স ১৬ বৎসর মেনে নিই, তাহলেও সেটাও তো ছিল খুবই কম। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স সে সময় ছিল ৫০ বৎসর। সে সময় তিনি ১৬ বৎসরের বালিকাকে কেন বিবাহ করলেন?

● প্রথম কথা হল এই যে, হযরত মুহাম্মদ

(সা.) স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই সম্পর্ক স্থাপন করতে চাননি। লোকেরা পরামর্শ প্রস্তাব দিয়েছিল। দ্বিতীয় কথা, স্বপ্নে তিনি যা দেখেছিলেন তা এক প্রকারে আল্লাহর আদেশ ছিল হযরত আয়িশা (রা.)-কে বিবাহ করার। এটাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি।

● একটা ১৬ বৎসরের মহিলাকে ৫০ বৎসরের পয়গম্বরকে বিবাহ করার আদেশ ঈশ্বর কেন দিলেন?

ঈশ্বর এক ১৬ বৎসর বয়স্কা মহিলাকে ৫০ বৎসরের পয়গম্বরের সঙ্গে বিবাহের নির্দেশ কেন দিয়েছিলেন?

● একটা শিশু ৩ বৎসর বয়সে জুনিয়র কেজিতে পড়ে।

৫ বৎসর বয়সে ক্লাশ ওয়ানে পড়ে।

১৫ বৎসর বয়সে দশম শ্রেণিতে পড়ে।

২১ বৎসর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হয়।

২৪ বৎসর বয়সে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট এবং

২৭ বৎসর বয়সে পিএইচডি উত্তীর্ণ হতে পারে।

পিএইচডি করার পর সে জীবনভর কোনও বিদ্যালয়ে দক্ষতার সঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতে পারে।

যে বিষয় ২৫ থেকে ২৭ বৎসরের মধ্যে শেখা হয়, সেটা ৪০ বৎসরের পরে ৬৭ বৎসর বয়সেও সঠিকভাবে স্মরণে থাকে এবংকাউকে শেখাতে পারে। কেননা কম বয়সে মস্তিষ্কে স্মরণ রাখার ক্ষমতা অধিক থাকে।

যদি কেউ ৪৫ বৎসর বয়সে কোনও বিষয় স্মরণে রাখার চেষ্টা করে তাহলে সে না ভালোভাবে স্মরণ করতে পারবে, আর না কাউকে ৪০ বৎসর পর অর্থাৎ ৮৪ বৎসর বয়সে কাউকে তা শেখাতে পারবে।

● এইজন্য ঈশ্বর এক ১৬ বৎসরের ছাত্রীকে (আয়িশা রা.-কে) বিশ্ববিদ্যালয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে উত্তমরূপে বিদ্যাচর্চা করান। হযরত আয়িশা (রা.) ১৬ বৎসর বয়স থেকে ২৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে উত্তম রূপে বিদ্যার্জন করেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পরও ৪০ বৎসর পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিটি কথাকে মানুষদের শোনাতে থাকেন। এইভাবে মৃত্যুর পরও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৈনন্দিন জীবনের সবকিছু পরবর্তী ৪০ বৎসর পর্যন্ত লোকেদের মধ্যে সজীব ছিল।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) পুরুষ-নারী উভয়েরই জন্য আল্লাহর বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। পবিত্রতা অর্জন করা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন। নারীদের প্রকৃতি পুরুষদের থেকে ভিন্ন। নারীরা মাসিক (ঋতুস্রাবের) সময় অপবিত্র থাকে। তারপর সন্তান প্রসব করার পর কয়েকদিন অপবিত্র থাকে। এইসব অবস্থা থেকে পবিত্রতা কিভাবে অর্জন করতে হবে এমন কিছু ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয় যা একজন মহিলা অন্য কোনও মহিলাকেই বলতে পারে। একজন পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) পুরুষ ছিলেন। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছিলেন। ফলে মেয়েদের ব্যক্তিগত বিষয়ে বলার জন্য এমন একজন

নারী (স্ত্রী) দরকার ছিল যাকে পয়গম্বর এসব বিষয়ে বলতে পারেন এবংশেখাতে পারেন। স্ত্রীর দ্বারা এই কাজভালোভাবে অবাধে নেওয়া যেতে পারে। তাই আল্লাহ এমন বয়সের স্ত্রী দান করলেন যিনি পয়গম্বরের জীবনে দীর্ঘ সময়কাল ব্যাপী অবস্থান করে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্জন করে মানুষদেরকে দীর্ঘদিন ধরে শেখাতে থাকেন। এমনই কাজআল্লাহ হযরত আয়িশা (রা.)-র মাধ্যমে করিয়ে নিয়েছেন।

● ইসলাম ধর্মের যা কিছু হাদীসে লেখা রয়েছে তার ৩০ শতাংশ বিদ্বানগণ (হাদীস বিশারদগণ) হযরত আয়িশা (রা.)-র কাছ থেকে পেয়েছেন।

এজন্য ঈশ্বর হযরত আয়িশা (রা.)-র কম বয়সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দিয়েছিলেন।

● মাওলানা মোহাম্মদ ফারুক খান তাঁর পুস্তক (হযরত আয়িশা কি শাদী আওর আসল উমার)-এ এই বিষয়ে মজবুত প্রমাণ পেশ করেছেন যে, হযরত আয়িশা (রা.)-র বিবাহের সময় বয়স ছিল ১৬ বৎসর।

(ফিরদাউস পাবলিকেশন, ১৭৮১, হাউজসুইওয়ালান, নিউ দিল্লি-১১০ ০০২)

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এই অভিযোগও আরোপ করা হয় যে, তিনি তাঁর পালক পুত্র হযরত যায়েদের (রা.) স্ত্রী হযরত যয়নাবকে (রা) হঠাৎ দেখলেন এবংতাঁর খুব ভালো লেগে গেল। এজন্য যায়েদ (রা.) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল এবংহযরত মুহাম্মদ (সা.) তার স্ত্রীকে বিবাহ করে নিলেন।

অন্যান্য অভিযোগের মতো এই অভিযোগও ভ্রান্ত। এই বিবাহের কারণ নিম্নে বর্ণিত হল–

● হযরত যয়নাব (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ফুফাতো (পিসতুতো) বোন ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যখন ২০ বৎসর বয়স তখন তার জন্ম হয়।

● হযরত যয়নাব (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সামনেই খেলাধুলো করতে করতে বড় হয়েছিলেন। তাঁর সামনেই যুবতী হয়েছিলেন।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একজন গোলাম ছিল, যার নাম হযরত যায়েদ (রা.)। শৈশবস্থা থেকেই সে তাঁর কাছে ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের পালক পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। যখন তারা দু'জনেই যৌবনে উপনীত হ'ল তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের দু'জনের মধ্যে বিবাহ দিলেন। যদি হযরত যয়নাব (রা.)-কে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খুবই পছন্দ হয়ে থাকত তাহলে তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-র সঙ্গে বিবাহ না দিয়ে নিজেই বিবাহ করে নিতেন।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশ সব থেকে সম্মানিত বংশ। যয়নাব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বংশের মেয়ে ছিলেন। আর গোলামদের খুবই নীচু ভাবা হত। এজন্য হযরত যয়নাব (রা.) এবংহযরত যায়েদ (রা.)-র মধ্যে সবসময় মনোমালিন্য হ'ত। পরিণামে হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নাব (রা.)-কে তালাক দিয়ে দিলেন।

● আরবদেশে একটা পরম্পরাগত প্রথা ছিল যে, পালক পুত্রকে নিজের ঔরসজাত

পুত্রের ন্যায় মনে করা হত। পালক পুত্রের পিতার নামের জায়গায় নিজেদের (পালক পিতার) নাম লেখা হ'ত। পালক পুত্রকে সম্পত্তির ভাগও দেওয়া হ'ত ওয়ারীশদের মতো।

● এইসব প্রথা ঈশ্বরের অপছন্দ। মানুষ তার খেয়ালখুশি মতো নিজের ঔরসজাত পুত্র-কন্যাদের নিজসম্পদ থেকে যেমন বেদখল করতে পারেন না, তেমনি অন্য কাউকে নিজের পুত্র-কন্যা বানিয়ে তাদেরকে সম্পত্তির অংশীদার বানিয়ে নিতে পারে না।

বিবাহের জন্য যেসব সম্পর্ক বৈধ, পালক পুত্র-কন্যা গ্রহণ করাতে তা অবৈধ হয়ে যায় না।

● মৌখিক সম্পর্কের কোনও মূল্য নেই। সমাজের জনমনে এই কথাকে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপন করার নিমিত্তে ঈশ্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও যয়নাব (রা.)-এর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। পুত্রবধুকে কোনও পিতা বিবাহ করতে পারে না। (এখানে যায়েদ পুত্র ছিল না। যয়নাবও পুত্রবধু ছিল না। যা ছিল তা সব মৌখিক।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ১২টি বিবাহের মধে এই বিবাহ পৃথিবীতে সম্পন্ন হয়নি। বরংস্বর্গে হয়েছিল। যেমন হযরত আদম আ. এবংহযরত হাওয়া (আ.)-এর মধ্যে বিবাহ স্বয়ংঈশ্বর দিয়েছিলেন, তেমনই ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত যয়নাব (রা.)-র বিবাহও ঈশ্বর নিজেসম্পন্ন করিয়েছিলেন। এই বিবাহের বর্ণনা কুরআনে এইভাবে দেওয়া হয়েছে—

('হে নবী! তুমি স্মরণ কর), তুমি যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলছিলে— যার উপর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহ করেছেন এবংতুমিও (নিজের পুত্র বানিয়ে) যার উপর অনুগ্রহ করেছ। (তুমি তাকে বলেছিলে) তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিয়ের বন্ধনে) রেখে দাও এবংআল্লাহকে ভয় কর, (কিন্তু এ পর্যায়ে) তোমার মনের ভিতর যে কথা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে আল্লাহ পরে তা প্রকাশ করে দিলেন, (আসলে তোমার পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে) তুমি মানুষদের (কথাকেই) ভয় করছিলে, অথচ (তুমি জানো) আল্লাহই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার বেশি হকদার। অতঃপর (এক সময়) যখন যায়েদ তার (স্ত্রীর) কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন শেষ করে (তাকে তালাক দিয়ে) দিল, তখন আমি তোমার সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন করে দিলাম। যাতে করে (ভবিষ্যতে) মুমিনদের উপর তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের বিবাহের মধ্যে (আর) কোনও সংকীর্ণতা অবশিষ্ট না থাকে, (বিশেষ করে) তারা যখন তাদের স্ত্রীদের নিকট থেকে নিজেদের প্রয়োজন শেষ করে (তাদের তালাক দিয়ে) দেয়, (আর সর্বশেষে) আল্লাহর আদেশই কার্যকর হবে।' (পবিত্র কুরআন-৩৩:৩৭)

[যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) জানতে পারলেন যে, তালাকের পর আল্লাহতায়ালা হযরত যয়নাব (রা.)-র সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এই ভেবে যে, লোকেরা কি মনে করবে আর এটা খুবই বদনামের ব্যাপার হবে। তিনি চাচ্ছিলেন যে, তালাক যেন না হয় আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন এই প্রথা পয়গম্বরের মাধ্যমে ভেঙে যাক (নির্মূল হয়ে যাক)। পরিশেষে আল্লাহ যেটা চাচ্ছিলেন

সেটাই হ'ল।)]

হযরত যয়নাব (রা.)-কে তাঁর ঘরে হঠাৎ দেখে ফেলার যে বিষয় সেটাও ভুল। তার কারণ হল–

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কারও ঘরে সালাম না দিয়ে এবংঅনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করো না। (পবিত্র কুরআন-২৪:২৬-২৭)

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন : 'নিজের মায়ের ঘরে যদি যেতে হয় তবুও বাইরে থেকে অনুমতি নাও, তারপর ভিতরে প্রবেশ কর।' (ইমাম মালিক, মুনতাখাবে আবওয়াব হাদীস নং. ৭৫৪)।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: 'যদি কারও বাড়িতে যেতে হয় তাহলে একেবারে দরজার সামনে সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করো না বা অনুমতি চেয়ো না, বরংদরজা থেকে সরে দাঁড়াও, যতে কোনও মহিলা পর্দাবিহীন অবস্থায় যদি দরজা খোলে তাহলে তুমি যেন তাকে দেখতে না পাও।' (আবু দাউদ, মুনতাখাবে আবওয়াব। খণ্ড-১, হাদীস নং. ৭৫৩)।

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন : 'আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজযে, তোমরা এমন সব কথা বলে বেড়াবে– যা তোমার করবে না।' (পবিত্র কুরআন- ৫১:৩)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে উপদেশ অন্যদেরকে দিতেন, তিনি নিজেতার উপর আমল করতেন।

সুতরাংকোনও মহিলাকে তার ঘরে হঠাৎ করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দেখে ফেলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আর হযরত যয়নাব (রা.)-কে তো হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্ম থেকেই দেখছিলেন। হঠাৎ পছন্দ হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে ? আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই তাঁর প্রথম বিবাহ হযরত যায়েদ রা.-র সঙ্গে দিয়েছিলেন। যদি তিনি চাইতেন তাহলে তাকে তিনিই বিয়ে করে নিতেন।

● সুতরাংহযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর আরোপিত এই বদনামও তাঁর শত্রুরাই আরোপ করেছিল যাতে তাঁর দুর্নাম করা যায়।

তাঁর অন্যান্য কয়েকটি বিবাহের কারণ

● হযরত উম্মে সালামা (রা.) তাঁর স্বামী মক্কাতে নির্যাতন সহ্য করতে করতে হয়রান হয়ে পড়েছিল। এজন্য মদীনায় হিজরত করতে চাইলেন এবংমদীনায় গমন করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। রাস্তায় হযরত উম্মে সালামার বংশের লোকেরা পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো এবংতাঁর স্বামীকে বলল– যদি তুমি যেতে চাও তো যাও, কিন্তু আমাদের বংশের মেয়েকে মদীনায় নিয়ে যেতে পারবে না। সেই লোকেরা হযরত উম্মে সালামা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাকে আটকে দিল। আর তাঁর স্বামী কাঁদতে কাঁদতে মদীনায় চলে গেলেন।

● যখন তাঁর স্বামীর বংশের লোকেরা এই ঘটনার খবর শুনলো তখন তারা ক্রোধান্বিত হয়ে বলল যে, মেয়ে তোমাদের ঠিকই কিন্তু তার কোলে যে বাচ্চা রয়েছে তার উপর পিতার অধিকার বেশি। সুতরাংওই বাচ্চা আমাদের গোত্রে থাকবে। এই বলে তারা ওই বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

● হযরত উম্মে সালামা (রা.) যখন স্বামী ও বাচ্চা দু'জনকেই হারিয়ে বসলেন তখন প্রতিদিন যে স্থানে তিনি স্বামীর থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন সেখানে যেতেন এবংসকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতে থাকতেন। এভাবেই এক বৎসর চলতে থাকল। পরিশেষে কারও মনে দয়ার উদ্রেক হ'ল এবংসে উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে তার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিল এবংমদীনায় যাওয়ার অনুমতি দিল।

● হযরত উম্মে সালামা (রা.) একাকী ৪০০ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবংমদীনায় গেলেন ও নিজের স্বামীর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি মদীনায় এক বৎসর থাকতে না থাকতে বিধবা হয়ে গেলেন। শত্রুরা মদীনা শহরকে ঘিরে রেখেছিল। মানুষরা মালপত্র নিয়ে বিক্রি করার জন্য অন্য শহরে নিয়ে যেতে পারছিল না। ফলে মানুষের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এই সময় একজন বিধবা ও তার বাচ্চাকে কে কতটা আশ্রয় দিতে পারত!

● কিন্তু বিবাহ না করে যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) উম্মে সালামাকে আশ্রয় দিতেন তাহলে আরও একটা বদনাম তাঁর উপর আরোপ করা হত। হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে এক সম্মানজনক জীবনযাপনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে বিবাহ করলেন।

● উম্মে হাবীবা আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। আবু সুফিয়ান ছিলেন মক্কার বড় সরদার, একজন রাজার মতো। তিনি মুসলমানদের কট্টর দুশমন ছিলেন। মুসলমানদের সঙ্গে মক্কাবাসীদের যত যুদ্ধ হয়েছে, সব যুদ্ধেই মক্কাবাসীদের সেনাপতি ছিলেন আবু সুফিয়ান। তাঁর কন্যা যখন মুসলমান হয়ে গেল তখন তার মাথার উপর পাহাড় ভেঙে পড়ল। বাধ্য হয়ে তিনি নিজের স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সঙ্গে হাবশায় (ইথওপিয়ায়), যে দেশ সউদী আরব থেকে সমুদ্র পার হয়ে আফ্রিকায়, চলে গেলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হল। মক্কার রাজনন্দিনী আফ্রিকায় অসহায় ও সম্বলহীন হয়ে পড়লেন। মক্কায় যদি ফিরে আসেন তাহলে নিজের পিতা তাঁর প্রাণের শত্রু, আর আফ্রিকায় তাঁর না আছে কোনও পরিচয়, না জানাশোনা, না আছে থাকা খাওয়ার সংস্থান। সামনে বাঘ পিছনে গর্ত– এই রকম এক পরিস্থিতির শিকার হলেন তিনি। এই অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে আশ্রয় দিলেন, এবংতাঁকে বিবাহ করে নিলেন।

● এইভাবে তিনি যতগুলি বিবাহ করেছিলেন তার পিছনে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য ছিল। কিছু মহত্বপূর্ণ কারণ ও উদ্দেশ্য ছিল, যেগুলি হতে পারে আমাদের জন্য বোধগম্য আবার এমনও হতে পারে যে, তা আমাদের বোধগম্যের বাইরে। কেননা আমার একবিংশ শতাব্দীতে বাস করছি, আর এ ঘটনা সপ্তম শতাব্দীর। সেই সময়কার সামাজিক অবস্থান, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা এইসময় পূর্ণরূপে অনুমান ও অনুধাবন করতে পারব না।

কেবলমাত্র একটি কথা মনে রাখবেন যে, কোনও ব্যক্তি পাপকর্ম করে পয়গম্বর হতে পারে না। সে হয় পাপী হবে, না হয় পয়গম্বর

হবে। একসঙ্গে দুইটি কখনও হতে পারবে না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্য পয়গম্বর ছিলেন এবংতিনি কখনও কোনও অন্যায় বা ভুল কাজকরেননি।

● জয়পুরের রাজা মানসিংহ ১২টা বিয়ে করেছিলেন। আর তাদের সকলকে একসঙ্গে রাখা তাঁর কাছে রাজ্য চালানোর থেকেও কঠিন ছিল। কিন্তু রাজ্যের একতা এবংপ্রতিরক্ষার স্বার্থে ছোট ছোট সামন্ত সরদারদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব করা জরুরী ছিল। এজন্য তাদের কন্যাদের মানসিংহ বিবাহ করেছিলেন এবংদেশে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

● তাঁর রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর ঘরে শান্তি বজায় রাখা তাঁর জন্য খুবই কঠিন ছিল। এজন্য যখনই কোনও রাণী মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করত, তখনই সেটা একজন মুহুরী (কেরাণী) লিখে রাখত। এবংযদি সেই রাণী কোনও ভুল কথা বা খারাপ কথা বলে ফেলত তাহলে শাস্তি স্বরূপ তাকে কিছু খাদ্যসামগ্রী চাক্কি ঘুরিয়ে পেষাই করতে হত। যখন দুই রাণীর মধ্যে লড়াই ঝগড়া শুরু হ'ত তখন তাদের পরিবারও লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ত।

● কেবল মান সিংহের ক্ষেত্রে নয় বরংযে কোনও ব্যক্তির পক্ষে দুই স্ত্রীর মধ্যে শান্তি বজায় রাখা এবংউভয়ের প্রতি সুবিচার করা খুবই কঠিন কাজ। এতে আনন্দের থেকে নিরানন্দই বেশি।

● জয়পুরের আমের কেল্লায় আজও সেই বারোজন রাণীর মহল মওজুদ রয়েছে। আপনি যখনই জয়পুর যাবেন এই ঐতিহাসিক শহরের দুর্গগুলি অবশ্যই দেখবেন।

****

৭৪. অগ্নির রহস্য কি?

অগ্নিকে বোঝার জন্য আমরা প্রথমে পবিত্র বেদের শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করব। তারপর পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলি অধ্যয়ন করব এবংএই রহস্য জানার চেষ্টা করব যে, অগ্নি কে?

পবিত্র বেদের শ্লোক

আমরা পবিত্র বেদগুলির শ্লোক অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছি:

● ঋগ্বেদের প্রথম শ্লোক:

'সমস্ত প্রশংসা এবংপ্রার্থনা অগ্নির জন্য।' (ঋগ্বেদ ১:১:১)

● 'হে অগ্নি! অপনিই মানুষের মনোষ্কামনা পূর্ণ করেন। আপনিই উপাসনার যোগ্য। আপনি বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবংবৃহস্পতি।' (ঋগ্বেদ ২:১:৩)

● 'মিত্র, বরুণ, অগ্নি, গুরু, যাম, বায়ু এসব একই শক্তির নাম। জ্ঞানবানরা এক ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যাবলীর ভিত্তিতে পৃথক পৃথক নামে সম্বোধন করে থাকেন।' (ঋগ্বেদ ১০:১১৪:৫)

উপরোল্লিখিত শ্লোকে একথা স্পষ্ট যে, অগ্নি ঈশ্বরেরই এক নাম। সেটা তাঁর বিশেষত্ব অনুসারে ব্যক্ত।

এখন বেদের আরও কিছু শ্লোক এখানে উল্লেখ করছি:

● 'আমি অগ্নিকে দূত নির্বাচন করেছি।' (ঋগ্বেদ ১:১২:১)।

● 'হে অগ্নি! মনু আপনাকে পয়গম্বররূপে স্বীকার করেছেন।' (ঋগ্বেদ ১:১৩:৪)

● 'অগ্নি সেই মানুষ যিনি ঈশ্বরের উপাসনাকারীদের প্রতি প্রসন্ন হন।' (ঋগ্বেদ ১:৩১:১৫)

● 'অগ্নিকে কেবল বিদ্বান মানুষরা চিনতে পারবে।' (ঋগ্বেদ ১০:৭১:৩)

● 'জ্ঞান মন্থন করা থেকে অগ্নির রহস্য উদ্ঘাটন হবে। আর এরই উপর তোমাদের মুক্তি নির্ভরশীল। অগ্নিকে মেনে তোমরা বিশ্বের নেতা (ইমাম) হবে।' (ঋগ্বেদ ১:৩১:১৫)

● 'অগ্নি রহস্যের অনুসন্ধান-অনুশীলন করবে মরুবাসীগণ।' (ঋগ্বেদ ৩:৩:৫)

● 'যখন শেষ মশাল (পবিত্র কুরআন)কে পুর্ববর্তী মশাল (পবিত্র বেদ)-এর উপর রাখা হবে (অর্থাৎ এক সঙ্গে পাঠ করা হবে) তখনই অগ্নির রহস্য উন্মোচিত হবে।' (ঋগ্বেদ ৩:২৯:৩০)

পবিত্র কুরআনের আয়াত

● পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াত (প্রথম বাক্য): 'সমস্ত প্রশংসা ঈশ্বরের জন্য যিনি গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক।' (পবিত্র কুরআন ১:১)

● 'হযরত ঈসা (আ.) বললেন: হে বনী ইসরাঈলের লোকেরা (অর্থাৎ ইহুদীরা), আমি তোমাদের কাছে পাঠানো আল্লাহর এক পয়গম্বর.... তোমাদের জন্য আমি এক সুসংবাদদাতা, আমার পর এক পয়গম্বর আসবে যার নাম আহমদ।' (পবিত্র কুরআন

৬১:৬)

● 'মুহাম্মদ তোমাদের কোনও পুরুষের পিতা নন এবংতিনি হচ্ছেন শেষ পয়গম্বর।' (পবিত্র কুরআন ৩৩:৪০)

● 'হে মুহাম্মদ! খুব শীঘ্রই আমি (ঈশ্বর) তোমাকে মাহমুদ (প্রশংসিত)-এর মর্যাদায় ভূষিত করব।' (পবিত্র কুরআন ১৭:৭৯)

● ঈশ্বর পবিত্র কুরআনে বলেছেন: 'আমি প্রাণবান সবকিছুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।' পবিত্র কুরআন ২১:৩০)।

● হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন : 'যদি হযরত মূসাও আজজীবিত থাকত তাহলে আমাকে পয়গম্বর রূপে স্বীকার না করে মুক্তি পেত না।' (তিরমিযী ১৪১:৩, আহমাদ ৩৩৮:৪)।

● কুরআনের এই আয়াতগুলির মধ্যে যে বিষয় স্মরণে রাখতে হবে তা হ'ল এই যে, একজনই মহাপুরুষের নাম ঈশ্বর তিনটি নামে উল্লেখ করেছেন—আহমাদ, মুহাম্মদ এবংমাহমুদ।

আহমাদ, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পৃথিবীতে জন্মানোর পূর্বের নাম ছিল। এই পৃথিবীতে তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ (সা.)। পরলোকে তাঁকে মাহমুদ নামে ভূষিত করা হবে।

এখন আমরা পুনরায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির আলোচনা করব

● এই পুস্তকে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ঈশ্বর নিজের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত নামে পয়গম্বরগণেরও সম্বোধন করেছেন। রহীম, গফুর যেগুলি ঈশ্বরের নাম, সেই নামে তিনি পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ সা.-কেও সম্বোধন করেছেন। ব্রহ্মা ঈশ্বরের নাম। এই নামে তিনি ভবিষ্য পুরাণে হযরত আদম (আ.)-কে এবংঅথর্ববেদে হযরত ইবরাহীম (আ.)কে সম্বোধন করেছেন।

অনুরূপভাবে অগ্নিও ঈশ্বরের এক গুণবাচক নাম। আর এই নামেও তিনি ঋগ্বেদে একজন পয়গম্বরকে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু তিনি কে, এটা অবগত হওয়ার জন্য আমার পবিত্র বেদের কয়েকটি নিম্নলিখিত শ্লোক আলোচনা করব।

● হে অগ্নি! আমি তোমার তিন রূপকে জানি। যেখানে যেখানে তোমার ঠিকানা সেই স্থানগুলিও সম্পর্কে আমি অবগত। আমি তোমার গুপ্ত নাম এবংতোমার জন্মস্থানকেও জানি। যেখান থেকে তোমার আগমন তাও জানি। (ঋগ্বেদ:১০:৪৫:২)

● অগ্নি স্বর্গলোকে বিদ্যুৎ রপে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছেন। দ্বিতীয় বার মানব জাতির মধ্যে প্রকট হয়েছেন, তখন তিনি 'জাতবেদ' (জন্মসূত্রেই জ্ঞান প্রাপ্ত) নামে পরিচিত হয়েছেন, তৃতীয় বার তিনি জলের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন। মানবজাতির কল্যাণকারীগণ সর্বদা সফল হয়ে থাকেন। (ঋগ্বেদ ১০:৪৫:১)

● 'যে অগ্নির অনন্ত রূপ কখনও শেষ হয় না, তাকে অশরীরী আত্মা বলে। যখন সে দেহ ধারণ করে তখন তাকে অসুর (সর্বশেষে আগত) এবংনরাশংস বলা হয়, এবংযখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করবে তখন হবে 'মাতারিশ্ব'। এবংওই সময় সে হাওয়ার মতো (সকলের জন্য লাভদায়ক) হয়।' (ঋগ্বেদ ৩:২৯:১১)

● যদি আমরা এই শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ করি তাহলে কোনও মহাপুরুষের চারপ্রকার অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

১) প্রথমাবস্থায় তিনি বিদ্যুতের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন। সেইসময় তাঁর নাম অগ্নি। সেইসময় তাঁর নাম হয় জাতবেদ (জন্মসূত্রে জ্ঞানপ্রাপ্ত)।

২) তাঁর দ্বিতীয় জন্ম মনুষ্যরূপে (আত্মারূপে) হয়ে থাকে।

বাস্তবে মানুষ এক আত্মা। তিনি পৃথিবীতে কেবলমাত্র দেহ ধারণ করেন এবংমৃত্যুর পর পরলোকে চলে যান। এ জন্য যখন কেউ মারা যায় তখন তার মৃতদেহ দেখে কেউ বলে না যে, লোকটা পড়ে আছে, বরংবলে লোকটার লাশ (শব) পড়ে আছে। এজন্য এখানে মানুষরূপে জন্ম হওয়ার অর্থ হ'ল বিদ্যুৎ বা বিজলির আকার থেকে মানুষের আত্মার রূপ নেওয়া।

৩) মহাপুরুষের তৃতীয় জন্ম পানিতে হয়। সেই সময় তাঁর নাম হয় অসুর এবংনরাশংস। পানিতে জন্ম নেওয়ার অর্থ হ'ল দেহ ধারণ করা। কেননা সমস্ত জীবিত প্রাণীকে ঈশ্বর পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। (পবিত্র কুরআন-২১:৩০) এবংপ্রত্যেক মানুষের শরীরে ৬৫ শতাংশ পানিই থাকে।

৪) মহাপুরুষের চতুর্থ অবস্থান পরলোকে প্রকাশিত হয়। সে সময় তাঁর নাম 'মাতারিশ্ব' হবে। আর তিনি সকলের কল্যাণ করবেন।

পুনরায় আমরা ইসলামী গ্রন্থসমূহের আলোচনা করব

● হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: আমি একবার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল, আপনি কখন পয়গম্বর হয়েছেন?' তখন তিনি জবাব দিলনে, 'আমি ওই সময়ও পয়গম্বর ছিলাম যখন হযরত আদম (আ.) নিজের আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থানে ছিলেন।' (তিরমিযী, মিশকাত, বাবে সাইয়্যেদ মুরসালীন ফাসল সানী)। অর্থাৎ যখন ঈশ্বর প্রথম মানুষ হযরত আদমকে তৈরী করতে যাচ্ছিলেন তখনও আমার অস্তিত্ব ছিল।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন: 'আল্লাহ প্রথমে আমার নূর সৃষ্টি করেছিলেন।' (দুর্বল হাদীস, মরকতব দফতর, তৃতীয় খণ্ড)

● পবিত্র কুরআনে ঈশ্বর বলেছেন' 'আমি হযরত মুহাম্মদকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' রূপে প্রেরণ করেছি।' (পবিত্র কুরআন, ২১:২০৭)।

'রহমাতুল্লিল আলামীন'-এর অর্থ সমগ্র বিশ্বের জন্য ঈশ্বরের কৃপা। সবার কল্যাণকারী। সকলের মুক্তির দিশারী।

● হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: কিয়ামত (প্রলয়)-এর দিন যখন সূর্যের উত্তাপে মানুষ পেরেশোন হয়ে পড়বে এবংসমস্ত মানুষ পয়গম্বরকে অনুরোধ করবে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করার জন্য যে, ঈশ্বর তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন এবংএই প্রখর উত্তাপের কষ্ট থেকে রক্ষা করুন, তখন কোনও পয়গম্বর ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সাহস পাবে না, যখন কোনও পয়গম্বর ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সাহস পাবে না, তখন মানুষরা আমার কাছে আসবে। তখন আমি দাঁড়িয়ে যাব এবংঈশ্বরের সম্মুখে সিজদা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সিজদায় পড়ে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বর আমাকে মাথা তোলার নির্দেশ না দেবেন। যখন ঈশ্বর আমাকে মাথা তোলার জন্য বলবেন তখন আমি মানুষের মুক্তির জন্য নিবেদন পেশ করব। এরপর ঈশ্বর আমাকে ওইসব মানুষদের নরক থেকে বাঁচানোর আশ্বাস দেবেন যারা শিরক করেনি। (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কিয়ামতের দিন এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানবজাতির জন্য মুক্তির নিমিত্ত (দিশারী) হবেন। (বুখারী, মুসলিম, মারুফুল হাদীস, খণ্ড ১, পৃ. ২৪৫)

এখন আমরা প্রত্যেকটি বিষয়কে

এক এক করে জুড়বো

● অগ্নির জন্ম সর্বপ্রথম, বিজলি বা বিদ্যুতের মতো হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জন্ম সর্বপ্রথম নূর (আলোর প্রকাশ বা জ্যোতি) রূপে হয়েছে।

● অগ্নির দ্বিতীয়বার জন্ম মানুষের আত্মার রূপে হয়েছে। নাম 'জাত-বেদ'। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম হযরত আদম (আ.)-এর পূর্বে রূহ্ (আত্মা)-এর আকারে হয়েছে। নাম 'আহমাদ'।

● অগ্নির তৃতীয় জন্ম পানিতে। নাম আসুর বা নরাশংস। ঈশ্বর মানবজাতিকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন (পবিত্র কুরআন-২১:৩০)। পানিতে জন্ম হওয়ার অর্থ হ'ল, দেহ ধারণ করা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাম মুহাম্মদ।

● অগ্নির চতুর্থরূপের নাম হবে 'মাতারিশ্ব'। কাজহবে বাতাসের মতো সকলের কল্যাণ করা। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চতুর্থ রূপের নাম হবে মাহমুদ। তাঁর কাজহবে পাপীদের মুক্তির জন্য কিয়ামতের দিন ঈশ্বরের কছে প্রার্থনা করা।

দুইজনের মধ্যে কোনও সমতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে কি?

● ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয়, যিনি প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক, বেদের জ্ঞান মন্থন করে এই বিষয় উন্মোচন করেছেন যে, বেদে যাঁকে 'নরাশংস', কল্কী অবতার এবংমহামে ঋষি বলা হয়েছে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর পুস্তক 'নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি' পড়লে আপনি বিস্তারিত ভাবে এ বিষয়ে জানতে পারবেন। এই বিষয়ে জানার জন্য আপনি আমার 'পবিত্র বেদ আওব ইসলাম ধর্ম' পুস্তকও পড়তে পারেন।

তাহলে যে পয়গম্বকে বেদে অগ্নি বলা হয়েছে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

● পবিত্র ঋগ্বেদে বলা হয়েছে– 'যখন অন্তিম মশালকে পূর্ববর্তী মশালের সঙ্গে পড়া হবে তখন অগ্নিকে চেনা যাবে।' এখন আমরা দু'টোই পাঠ করে এই রহস্য সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

● পবিত্র ঋগ্বেদ বলে, 'অগ্নিকে জানা এবংমানার পরই আমাদের কল্যাণ হবে এবংআমার এই জগতের নেতা হবো। তাহলে আসুন নিজেদের কল্যাণের দিকে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

● পবিত্র ঋগ্বেদ বলে, 'অগ্নিকে না জেনে এবংনা মেনে মুক্তি অসম্ভব। তাহলে আসুন, আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অন্তিম পয়গম্বর রূপে চিনে নিই এবংতাঁর আদেশ পালন করি। যেন মৃত্যুর পরও আমরা সফল হতে পারি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদেশ পালন কিভাবে শুরু করব?

● হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদেশ পালন শুরু করতে হবে দুটি কাজের মাধ্যমে।

১) আপনি মনের মধ্যে এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে নিন: এক ঈশ্বর (যিনি নিরাকার) ব্যতীত অন্য কারোরই পূজা ও উপাসনা করবেন না।

২) নিজের কর্মকে যতটা উৎকৃষ্ট করতে

পারবেন ততটা উৎকৃষ্ট করুন।
কর্মকে উৎকৃষ্ট বানানোর অর্থ হ'ল– পাপ কাজএকেবারেই ছেড়ে দিন। যেমন, অবৈধভাবে উপার্জন করবেন না। কাউকে ধোঁকা দেবেন না। চুরি করা ছাড়তে হবে। কারও সঙ্গে অন্যায় আচরণ করবেন না। সর্বদা সত্য কথা বলুন। অন্যের উপকার করবেন। সবসময় পরিচ্ছন্ন থাকুন। (প্রস্রাবের একটা ফোঁটা কিংবা কোনও ময়লা বা নোংরা জিনিসের সামান্য অংশও যেন আপনার শরীরে না লাগে) নিজের পরিবারের সঙ্গে এবংনিজের মাতাপিতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করুন। এইভাবে আপনি যদি একজন সত্যাশ্রয়ী মানুষ হতে পারেন তাহলে আপনি ঈমানদার রূপে পরিগণিত হবেন। ঈমানদার মানুষের কর্তব্য হ'ল– যে তার প্রভুর আদেশ মানবে এবংপয়গম্বরের দেখানো পথে চলে নিজের জীবন অতিবাহিত করবে। আমার লেখা বই 'কানুনে তরক্কী'-র মধ্যে আমি লিখেছি ব্যবসায় ইসলামী নিয়ম সম্পর্কে। এই পুস্তক পাঠ করে আপনি আপনার ব্যবসায়িক লেনদেন ও ব্যবহারকে শুধরে নিন। হৃদয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে থাকুন। ঈশ্বরের দুটি প্রধান নাম– 'হাদী' এবং'রহীম'। যখনই সময় পবেন 'ইয়া হাদী' ও 'ইয়া রহীম' এই নাম জপ করতে থাকুন।

● এই পর্যন্ত করার পর একবার পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়ে নিন। হাদীস পড়ুন এবংকোনও পরিচিত বিদ্বান ব্যক্তির সাহচর্যে থাকুন এবংনামায, রোযা, যাকাত, হজপ্রসঙ্গে বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করুন এবংসেই মতো কাজকরুন।

****

একনজরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী

তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহর মৃত্যু	মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের ৭ মাস পূর্বে, ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে।
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম	২০/ ২২ এপ্রিল, ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
দাইমা হালিমা তাঁকে গ্রামে নিয়ে গেলেন	বয়স ৪ মাস, ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ।
পুনরায় মায়ের কাছে ফিরে আসলেন	বয়স ৪ বৎসর, ৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।
মা আমিনার মৃত্যু	বয়স ৬ বৎসর, ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।
দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যু	বয়স ৮ বৎসর, ৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।
হযরত খাদীজার সঙ্গে বিবাহ	বয়স ২৫ বৎসর, ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।
হেরা গুহায় ইবাদাত শুরু	বয়স ৩৭ বৎসর, ৬০৭ খ্রিষ্টাব্দ।
পয়গম্বরী (নব্যুয়ত) প্রাপ্তি	বয়স ৪০ বৎসর, ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ।
বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের মধে ধর্ম প্রচার	বয়স ৪১ বৎসর, ৬১০-৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ।
নব্যুয়তের প্রকাশ্য ঘোষণা	বয়স ৪৪ বৎসর, ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ।
ইথিওপিয়াতে মুসলমানদের হিজরত	বয়স ৪৫ বৎসর, ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দ।
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গোত্রকে সামাজিক বহিষ্কার	বয়স ৪৭ বৎসর,৬১৬-৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ।
হযরত খাদীজা ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যু	বয়স ৫০ বৎসর, ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ।
তায়েফে গমন	বয়স ৫০ বৎসর ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ
হযরত খাদীজা ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যু	বয়স ৫০ বৎসর, ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ।
তায়েফে গমন	বয়স ৫২ বৎসর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ।
মেরাজের ঘটনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয	বয়স ৫২ বৎসর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ।
মসজিদে নববী নির্মাণের কাজশুরু (Migration)।	বয়স ৫২ বৎসর ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ।
কিবলা বদলের নির্দেশ	বয়স ৫৫ বৎসর ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ।
বদরের যুদ্ধ (এটাই প্রথম যুদ্ধ)	বয়য় ৫৫ বৎসর, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ।
ওহুদের যুদ্ধ (২য় যুদ্ধ)	বয়য় ৫৬ বৎসর, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ।
তৃতীয় যুদ্ধ (খন্দকের যুদ্ধ)	বয়স ৫৮ বৎসর, ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ।
হুদাইবিয়ার সন্ধি	বয়স ৫৯ বৎসর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ।
খায়বাণ্ল ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ	বয়স ৬০ বৎসর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ।

একনজরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী

খায়বাণ্র ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ	বয়স ৬০ বৎসর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ।
মু'তার যুদ্ধ, রোম সেনার বিরুদ্ধে	বয়স ৬০ বৎসর, ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ।
মক্কা বিজয়	বয়স ৬১ বৎসর, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ।
হুনাইনের যুদ্ধ	বয়স ৬১ বৎসর, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ।
তাবুক সফর	বয়স ৬২ বৎসর, ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ।
শেষ হজও শেষ খুৎবা (ভাষণ)	বয়স ৬৩ বৎসর, ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ।
সুস্থতা ও ওফাত (মৃত্যু)	বয়স ৬৩ বৎসর, ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে এবংবিভিন্ন ঘটনাবলীর তারিখ, ইতিহাস এসব সৌর ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। এজন্য বয়স ও তারিখের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

MR. Q.S. KHAN IS ALSO AUTHOR OF FOLLOWING BOOKS.

Management Topics:-

- Law of success for both the Worlds.
  (Translated in Hindi & Marathi)
- How to Prosper Islamic Way?
  (Translated in Hindi & Urdu)

Religious Topics:-

- Teaching of Vedas and Quran
  (Translated in Hindi, Marathi & Gujarat)
- Hajj Journey Problems and their easy Solutions.
  (Translated in Urdu, Hindi, Gujarati, Bengali)
- Kya her Mah Chand dekhna Zaroori hai?
  (Translated in English, Arabic)

Engineering Topics:-

- Design and Manufacturing of Hydraulic Presses

All above mentioned books and many books could be studied and freely downloaded from:

www.freeeducation.co.in
www.tanveerpublication.com

এই পুস্তক লেখার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমি ওই সমস্ত লেখক ও প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ।

১। পবিত্র কুরআন (অনুবাদ: ফাতেহ মুহাম্মাদ জলন্ধরী)
২। মারুফুল হাদীস (মৌলানা মোহাম্মাদ মনজুর নোমানী)
৩। আব ভি না জাগে তো (মৌলানা শানস্র নাবীদ উসমানী, সৈয়দ আব্দুল্লাহ তারীক জাসিন বুক ডিপো। উর্দু বাজার, জমনা মসজিদ, দিল্লি)য
৪। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আওর ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ।
(ড. এম এ শ্রীবাস্তব, ন্যাশনাল প্রিন্টিংপ্রেস, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লি)
৫। Hazrat Mohammad in World Scripture
(Adam Publishers & Distributors, 1542, Pataudi House, Dariaganj)
৬। পয়গম্বরে ইসলাম গায়ের মুসলিমোঁ কে নযর মে।
(মোহাম্মদ ইয়াহ্য়িা খান, ফরীদ বুক ডিপো, নিউ দিল্লি-১১০ ০০২)
৭। সীরাতে আহমদা মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
(শাহ মিসবাহুদ্দীন শাকিল, আর রহমান প্রিন্টার্স আওর পাবলিশার্স)
১৮ যাকারিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
৮। The Quran & Modern Science
(Dr. Zakar Naik, Publishers, Islamic Research Foundation
56/58, Tandel Street, North, Dongri, Mumbai-400 009)
৯। সীরাতে নবী
(লেখক আল্লামা শিবলী নোমানী রহ. (সৈয়দ সুলায়মান নাদবী)
১০। সন্ত, মহাত্মা, বিচারবন্ত আওর ইসলাম
(সংকলক: সোমনাথ দেশকর, পুনে-৪১১ ০৫৯)